ISSN 0971-5800

জানুয়ারি ২০১০

উৎস মানুষ

আইলা ও প্রশ্নের ঝড়

মুক্তি আন্দোলন দমনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ

প্রেমানন্দ নেই, গুরুবাবারা নিশ্চিন্ত!

কল্পলোকের নায়ক গণপতি

উৎস মানুষ

৩০ বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি ২০১০

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আহরণ		২
বেহিসেবি শক্তি খরচ	সুজয় বসু	৫
অপ্রিয়	প্রতুল মুখোপাধ্যায়	১০
কল্পলোকের নায়ক	সমীরকুমার ঘোষ	১১
আইলা ও প্রশ্নের ঝড়	অঞ্জনকুমার সেনশর্মা	১৪
পরিবেশ ভাবনা	শঙ্কর গুহনিয়োগী	১৮
প্রেমানন্দ নেই	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২৭
লড়াকু বন্ধু আর নেই	পূরবী ঘোষ	৩০
কুষ্ঠ কি সারবে	জয়ন্ত দাস	৩২
বিজ্ঞানশিক্ষা ও প্রসার	আশীষ লাহিড়ী	৩৯
আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ	শশবিন্দু চৌধুরি	৪১
মুক্তি আন্দোলন দমনে	দিলীপকুমার গুপ্ত	৪৪
বিজ্ঞানের খণ্ডদৃষ্টি	সমর বাগচী	৫১

উৎস মানুষ

উৎস মানুষ

ISSN 0971-5800

বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা ৬৪

অস্থায়ী কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর) গোপালপুর, কলকাতা-৭০০ ১৩৬

আমাদের কথা

বইমেলা এলেই গত এক-দেড় দশক যে প্রশ্নগুলো বড় হয়ে দাঁড়ায় তা হল — মেলার ঝক্কি কে সামলাবে, কে স্টল আগলাবে, পয়সা কোথা থেকে আসবে ইত্যাদি। এবং এই সব সমস্যাকে উড়িয়ে উৎস মানুষ যথারীতি এবারও বইমেলায়। পাঠকবন্ধু, শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে সরাসরি ভাব-বিনিময়ের এই সহজ উপায় ছাড়তে আমরা আদৌ রাজি নই।

বইমেলা হচ্ছে আর অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় নেই, এটা ভাবাই যেত না। অথচ বাস্তবে দু বছর তা-ই ঘটছে। শারীরিক কষ্ট, ধুলোর শত্রুতা সত্ত্বেও প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্যও স্টলে আসত । ওর সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে কত দূর দূর থেকে মানুষ আসতেন তার ইয়ত্তা নেই। অফুরান প্রাণশক্তির সেই মানুষটা আর নেই, এটা ভাবতেও আমাদের কষ্ট হয়। তবু বাস্তব তো মানতেই হয়!

উৎস মানুষ প্রকাশ করার কি কোনো যৌক্তিকতা আছে — প্রশ্নটা আমরা অনেকদিনই নিজেদের করি। এর উত্তর— আছে, তার কারণ এখনও ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান কে রাধাকৃষ্ণণ পদ পেয়ে গুরুবায়ুরে মন্দিরে পুজো দিতে যান, কীর্তন শোনাতে বসে পড়েন; রাধানাথ শিকদার, গণপতি চক্রবর্তীরা এখনও অবহেলিত, উপেক্ষিত; বিজ্ঞানের নামে জিন বদলানো বিষ খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা হয়...।

বহু শুভানুধ্যায়ী আমাদের নিয়মিত নানা উপদেশ, পরামর্শ দেন। তারই একটা হল — পত্রিকায় প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসাবে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রতি সংখ্যায় উল্লেখ করা। এঁদের আমরা সবিনয় একটা কথা মনে করিয়ে দিই — উৎস মানুষ পত্রিকা ছিল এক সমষ্টিগত উদ্যোগ, এক আন্দোলন। এখনও তা আছে। এখানে ব্যক্তিবিশেষকে তুলে ধরার কোনো সুযোগ ছিল না। তাই বরাবরই সম্পাদকের পরিবর্তে 'পরিচালকমণ্ডলী' কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে (কিছুদিনের ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে)। এমনকি লেখকদের নামের আগে ডঃ, ডা. জাতীয় শব্দগুলোও লেখা হত না।

অন্য পত্রিকা, যারা প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের নাম বিজ্ঞাপিত করে তাদের সঙ্গে আমাদের গঠনগত, আদর্শগত ফারাক আছে। এতে কেউ যদি মনে করেন উৎস মানুষ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যথোচিত সম্মান দেখাচ্ছে না, আমরা নিরুপায়! উৎস মানুষ-এর সঙ্গে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটা এমনই একাত্ম, তাকে আলাদা করা যাবে না। আমাদের তেমন কোনো অভিপ্রায়ও নেই। যাঁরা দুশ্চিন্তায় ভুগছেন, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতায় তাঁদের অনুপস্থিতি উল্টেআমাদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। সবাই পাশে থাকুন, উৎস মানুষ থাকবে, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ও থাকবে।

সম্পাদকমণ্ডলী

আহরণ

বিজ্ঞানের বিভীষিকা

অনেক বৎসর আগের ঘটনা। দুটি ছেলে ভ্রূকুটি করে ঠোঁট কামড়ে হাতে ইট নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বয়স দশ-এগারো, সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। এরা প্রচণ্ড ঝগড়া করেছে, এখন পরস্পর ভয় দেখাচ্ছে, হয়তো একটু পরেই ইট ছুড়বে। তার পরিণান কি সাংঘাতিক হবে তা এরা মোটামুটি বোঝে, তবু মারতে প্রস্তুত আছে। এদের মায়েরা দূর থেকে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। দুজনেই আমার ভাগনে, একটু খাতিরও করে, সুতরাং এদের নিরস্ত্র করতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি।

মার্কিন আর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কর্তাদের বর্তমান অবস্থা প্রায় ওই রকম, কিন্তু ওদের মামা নেই। এই দুই পরাক্রান্ত রাষ্ট্র পরমাণুবোমা উদ্যত করে পরস্পর বিভীষিকা দেখাচ্ছে, মানবজাতি ত্রস্ত হয়ে আছে। রফাপ চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তা সফল হবে কিনা বলা যায় না। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুই মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে, আর একটা মহত্তর প্রলয়ংকর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছেন, এই পৃথিবীব্যাপী আতঙ্ক আর অশান্তির মূল হচ্ছে বিজ্ঞানের অতিবৃদ্ধি। এদের যুক্তি এই রকম।

পরমাণুবোমা আবিষ্কারের পূর্বে যুদ্ধ এত ভয়াবহ ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে আকাশযানের সংখ্য কম ছিল, সেজন্য বোমা-বর্ষণে ব্যাপক ভাবে জনপদ ধ্বংস হয় নি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্স-প্রুশিয়া যুদ্ধ, তার পর ব্রিটিশ-বোঅর আর রুশ-জাপান যুদ্ধ প্রধানত দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যেই হয়েছিল, জনসাধারণের আর্থিক ক্ষতি হলেও লোকক্ষয় বেশী হয় নি। মেশিন-গান দূরক্ষেপী কামান, টরপিডো, সবমেরীন, বোমা-বর্ষী বিমান, এবং পরিশেষে পরমাণুবোমা উদ্ভাবনের ফলে মানুষের নাশিকা-শক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো অন্যান্য উৎকট মারাত্মক উপায় প্রযুক্ত হবে, মহামারীর বীজ ছড়িয়ে বিপক্ষের দেশ নির্মনুষ্য করা হবে, অথবা এমন গ্যাস বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ উদ্ভাবিত হবে যার স্পর্শে দেশের সমস্ত লোক জড়বুদ্ধি হয়ে ভেড়ার পালের মতন আত্মসমর্পণ করবে। মোট কথা, মানুষ বিজ্ঞান শিখেছে কিন্তু শ্রেয়স্কর জ্ঞান লাভ করে নি, বহিঃ-প্রকৃতিকে কতকটা বশে আনলেও অন্তঃপ্রকৃতিকে সংযত করতে পারে নি। তার স্বার্থবুদ্ধি প্রাচীন কালে যেমন সংকীর্ণ ছিল এখনও তাই আছে। বানরের হাতে যেমন তলোয়ার, শিশুর হাতে যেমন জ্বলন্ত মশাল, অদূরদর্শী অপরিণতবুদ্ধি মানুষের হাতে বিজ্ঞানও তেমনি ভয়ংকর। অতএব বিজ্ঞানচর্চা কিছুকাল স্থগিত থাকুক — বিশেষ করে রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা, কারণ এই দুটোই যত অনিষ্টের মূল। চন্দ্রলোকে যাবার বিমান, রেডিও-টেলিভিশন মারফত বিদেশবাসীর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ, রেশমের চাইতে মজবুত কাচের সুতোর কাপড়, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য আমরা দশ-বিশ বৎসর সবুর করতে রাজী আছি। মানুষের ধর্মবুদ্ধি যাতে বাড়ে সেই চেষ্টাই এখন সর্বতোভাবে করা হক।

এই অভিযোগের প্রতিবাদে বিজ্ঞানচর্চার সমর্থকগণ বলতে পারেন — সেকালে যখন বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নি তখন কি মানুষের সংকট কম ছিল? নেপোলিয়নের আমলে যে সব যুদ্ধ হয়েছিল, তার আগে থার্টি ইয়ার্স ওঅর, ক্যাথলিক-প্রোটেস্টন্টদের ধর্মযুদ্ধ, তুর্ক কর্তৃক ভারত অধিকার, খ্রীষ্টান-মুসলমানদের ক্রুজেড ও জেহাদ, সম্রাট অশোক আর আলেকজান্ডারের দিগ্‌বিজয়, ইত্যাদিতেও বিস্তর প্রাণহানি আর বহু দেশের ক্ষতি হয়েছিল। সেকালে লোকসংখ্যার অনুপাতে যে লোকক্ষয় হ'ত তা একালের তুলনায় কম নয়।

প্রতিবাদীরা আরও বলতে পারেন — বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে কি অনিষ্ট হয়েছে শুধু তা দেখলে চলবে কেন, সুপ্রয়োগে কত উপকার হয়েছে তাও দেখতে হবে। খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে, দুর্ভিক্ষ কমেছে চিকিৎসার উন্নতির ফলে শিশুমৃত্যু কমেছে, লোকের পরমায়ু বেড়েছে। রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ টেলিফোন মোটর গাড়ি এয়ারোপ্লেন সিনেমা রেডিও প্রভৃতির প্রচলনে মানুষের সুখ কত বেড়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। অতএব বিজ্ঞানের চর্চা নিষিদ্ধ করা ঘোর মূর্খতা।

উক্ত বাদ-প্রতিবাদের বিচার করতে হলে দুটি বিষয় পরিষ্কার করে বোঝা দরকার — বিজ্ঞান শব্দের অর্থ, এবং মানবস্বভাবের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ।

সায়েন্স বা বিজ্ঞান বললে দুই শ্রেণীর বিদ্যা বোঝায়। দুই বিদ্যাই পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষার ফলে লব্ধ, কিন্তু একটি নিষ্কাম, অপরটি সকাম অর্থাৎ অভীষ্টসিদ্ধির উপায় নির্ধারণ। প্রথমটি শুধুই জ্ঞান, দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে শিল্পসাধনা। মানুষের আদিম অবস্থা থেকে বিজ্ঞানের এই দুই ধারার চর্চা হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাচীন গানে আছে — মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে, আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে। যারা বিস্ময় বোধ করে না এমন প্রাকৃত জনের সংখ্যাই জগতে বেশী। যাঁরা বিস্ময়ের ফলে রসাবিষ্ট বা ভাবসমন্বিত হন তাঁরা কবি বা ভক্ত। আর, বিস্ময়ের মূলে যে রহস্য আছে তার সমাধানের চেষ্টা যাঁরা করেন তাঁরা বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের এক দল জ্ঞানলাভেই তৃপ্ত হন, এঁরা নিষ্কাম শুদ্ধবিজ্ঞানী। আর এক দল নিজেদের বা পরের

লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগান, এরা সকাম ফলিতবিজ্ঞানী। সংখ্যায় এঁরাই বেশী।

জ্যোতিষের অধিকাংশ তত্ত্বই নিষ্কাম বিদ্যা। হেলির ধূমকেতু প্রায় ছিয়াত্তর বৎসর অন্তর দেখা দেয়, মঙ্গল গ্রহের দুই উপগ্রহ আছে, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ ফেঁপে উঠছে — এই সব জেনে আমাদের আনন্দ হতে পারে কিন্তু অন্য লাভের সম্ভাবনা নেই, অন্তত আপাতত নেই। সেগুন আর ঘেঁটু একই বর্গের গাছ, চামচিকার দেহে রাডারের মত যন্ত্র আছে, তারই সাহায্যে অন্ধকারে বাধা এড়িয়ে উড়ে বেড়াতে পারে — ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এখনও কোনও সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্যে লাগানো যায় নি। চুম্বক লোহা টানে, তার এক প্রান্ত উত্তরে আর এক প্রান্ত দক্ষিণে আকৃষ্ট হয় — এই আবিষ্কার প্রথমে শুধু জ্ঞানমাত্র বা কৌতূহলের বিষয় ছিল কিন্তু পরে মানুষের কাজে লেগেছে। তপ্ত বা সিদ্ধ করলে মাংস সুস্বাদু হয় — এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনকলার উৎপত্তি হয়েছে।

ভাল মন্দ নানা রকম অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মানুষ চিরকাল অন্ধভাবে বা সতর্ক হয়ে চেষ্টা করে আসছে। মোটামুটি কার্যসিদ্ধি হলেই সাধারণ লোকে তুষ্ট হয়, কিন্তু জনকতক কুতূহলী আছেন যাঁরা কার্য আর কারণের সম্বন্ধ ভাল করে জানতে চান। তাঁরাই বিজ্ঞানী। আদিম মানুষ আবিষ্কার করেছিল যে আগুনের উপর জল বসালে ক্রমশ গরম হতে থাকে, তার পর ফোটে। বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে জানলেন — আঁচ যতই বাড়ানো হক, ফুটতে আরম্ভ করলে জলের উষ্ণতা আর বাড়ে না। আমাদের দেশের অনেক পাচিকা এই তত্ত্ব জানে না, জানলে ইন্ধনের খরচ হয়তো একটু কমত।

কান্ডজ্ঞান (common sense), সাধারণ অভিজ্ঞতা, আর বিজ্ঞান — এই তিনের মধ্যে আকাশ পাতাল গুণগত ব্যবধান নেই। স্থূল সূক্ষ্ম সব রকম জ্ঞানই পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ অনুমান ইত্যাদি দ্বারা লব্ধ, কিন্তু বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে তা সাবধানে অর্জিত, বহু প্রমাণিত, এবং তাতে কার্যকারণতা যথাসম্ভব নিরূপিত। বিজ্ঞান শব্দের অপপ্রয়োগও খুব হয়। চিরাগত ভিত্তিহীন সংস্কার, শিল্পকলা, এমনকি খেলার নিয়মও বিজ্ঞান নামে চলে। ফলিত জ্যোতিষ আর সামুদ্রিককে বিজ্ঞান বলা হয়, দরজীবিজ্ঞান শতরঞ্জবিজ্ঞানও শোনা যায়।

যাঁরা নিষ্কাম জিজ্ঞাসু, লাভালাভের চিন্তা যাঁদের নেই, এমন জ্ঞানযোগী শুদ্ধবিজ্ঞানী অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের চাইতে অনেক বেশী আছেন যাঁরা ফলকামী, বিজ্ঞানের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করতে চান। নিউটন, ফ্যারাডে, কুরী-দম্পতি ও কন্যা, আইনস্টাইন প্রভৃতি প্রধানত শুদ্ধবিজ্ঞানী, যদিও তাঁদের আবিষ্কার অন্য লোকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু এঞ্জিন টেলিফোন ফোনোগ্রাফ রেডিও রাডার প্রভৃতি যন্ত্রের, সালভার্সান স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি ঔষধের, এবং বন্দুক কামান টরপিডো আর অ্যাটম-হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্রের উদ্ভাবকগণ ফল লাভের জন্যই বিজ্ঞানচর্চা করেন। এঁদের কাছে বিজ্ঞান মুখ্যত কার্যসিদ্ধির উপায়, উকিলের কাছে আইনের জ্ঞান যেমন মকদ্দমা জেতবার উপায়। নব নব তত্ত্বর আবিষ্কার এবং তত্ত্বের প্রয়োগ — এই দুই বিদ্যাই বিজ্ঞান, কিন্তু বিদ্যার যদি অপপ্রয়োগ হয় তবেই তা ভয়ংকরী।

ইতর প্রাণীর যেটুকু জ্ঞান আছে তার প্রায় সমস্তই সহজাত, কিন্তু মানুষ নূতন জ্ঞান অর্জন করে, কাজে লাগায়, এবং অপরকে শেখায়। মানবস্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই শিল্পকলা আর বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে। মানুষ নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে বিদ্যার সুপ্রয়োগ বা কুপ্রয়োগ করে। দুষ্ট লোকে দলিল জাল করে, অনিষ্টকর পুস্তক প্রচার করে, কিন্তু সেজন্য লেখাপড়া নিষিদ্ধ করতে বলে না। চোরের জন্য সিঁধকাঠি আর গুন্ডার জন্য ছোরা তৈরী হয়, বিষ-ঔষধ দিয়ে, মানুষ খুন করা হয়, কিন্তু কেউ চায় না যে কামারের কাজ আর ঔষধ তৈরী স্থগিত থাকুক।

কূটবুদ্ধি নিষ্ঠুর লোকে বিজ্ঞানের অত্যন্ত অপপ্রয়োগ করেছে, অতএব সর্বসম্মতিক্রমে সকল রাষ্ট্রে বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত থাকুক — এই আবদার করা বৃথা। হবুচন্দ্রের রাজ্যে সে রকম ব্যবস্থা হতে পারত, কিন্তু এখনকার কোনও রাষ্ট্র এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করবে না। যুদ্ধবিরোধী অহিংস ভারতরাষ্ট্র সর্বপ্রকার উৎকট মারণাস্ত্রের লোপ চায়, কিন্তু ভাল কাজে লাগতে পারে এই আশায় পারমাণবিক গবেষণাও চালাচ্ছে।

বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত রাখলে এবং পরমাণুবোমা নিষিদ্ধ করলেও সংকট দূর হবে না। আরও নানারকম নৃশংস যুদ্ধাস্ত্র আছে — টি-এন-টি আর ফসফরাস বোমা, চালকহীন বিমান, শব্দভেদী টরপিডো ইত্যাদি। যখন কামান বন্দুক ছিল না তখন্য মানুষ ধনুর্বাণ তলোয়ার বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করেছে। দোষ বিজ্ঞানের নয়, মানুষের স্বভাবেই দোষ।

অরণ্যবাসকালে শস্ত্রপাণি রামকে সীতা বলেছিলেন — কদর্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ — শস্ত্রে সংসর্গে বুদ্ধি কদর্য ও কলুষিত হয়। এই বাক্য সকল যুগেই সত্য। পরম মারণাস্ত্র যদি হাতে থাকে তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে সংযম অবলম্বন করা কঠিন। কিন্তু সকল দেশের জনমত যদি প্রবল হয় তবে অতিপরাক্রান্ত রাষ্ট্রকেও অস্ত্র সংবরণ করতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধে বিষ-গ্যাস ছাড়া হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হয় নি, আয়োজন থাকলেও জনমতের বিরোধিতার জন্য দুই পক্ষই সংযত হয়েছিল। পরমাণুবোমার বিরুদ্ধেও যদি প্রবল আন্দোলন হয় তবে সমগ্র সভ্য মানবসমাজের ধিক্কারের ভয়ে আমেরিকা-রাশিয়াকেও সংযত হতে হবে। আশার কথা, যাঁদের কোনও কূট অভিসন্ধি নেই এমন শান্তিকামীরা ঘোষণা করছেন যে পরমাণুবোমা ফেলে জনপদ ধ্বংস আর অগণিত নিরীহ প্রজা হত্যার চাইতে মহাপাতক কিছু নেই। অনেক বিজ্ঞানীও প্রচার

করছেন যে শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্যেও যদি পরমাণুবোমা বার বার বিস্ফোরণ হয় তবে তার কুফল এখন দেখা না গেলেও ভবিষ্যৎ মনাবসন্তানের দেহে প্রকট হবে।

ক্রীতদাস প্রথা এক কালে বহুলপ্রচলিত ছিল, কিন্তু জনমতের বিরোধিতায় এখন প্রায় লোপ পেয়েছে। শক্তিশালী জাতিদের উপনিবেশপদ্ধতি এবং দুর্বল জাতির উপর প্রভুত্ব ক্রমশ নিন্দিত হচ্ছে। কালক্রমে এই অন্যায়ের প্রতিকার হবে তাতে সন্দেহ নেই। আফিম কোকেন প্রভৃতি মাদকের অবাধ বাণিজ্য, জলদস্যুতা, পাপব্যবসায়ের জন্য নারীহরণ প্রভৃতি রাষ্ট্রসংঘের সমবেত চেষ্টায় বহু পরিমাণে নিবারিত হয়েছে। লোকমতের প্রভাবে পরমাণুশক্তির যথেচ্ছ প্রয়োগও নিবারিত হতে পারবে। এচ. জি. ওয়েলস্, ওয়েন্ডেল উইল্‌কি প্রভৃতি যে একচ্ছত্র বসুধার স্বপ্ন দেখেছেন তা যদি কোনও দিন সফল হয় তবে হয়তো যুদ্ধও নিবারিত হবে।

এক কালে পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের আদর্শ ছিল — সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা। আজকাল শোনা যায় — মহৎ চিন্তা অবশ্যই চাই,, কিন্তু জীবনযাত্রার মান আর সর্ববিধ ভোগ বাড়িয়ে যেতে হবে তবেই মানবজীবন সার্থক হবে। এই পরম পুরুষার্থ লাভের উপায় বিজ্ঞান। অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য আর ভোগসুখের বৃদ্ধি। ভারতের শাস্ত্র বিপরীত কথা বলেছে — ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনা শান্ত হয় না, আরও বেড়ে যায়। পাশ্চাত্ত্য সমৃদ্ধ দেশে বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ফলে দুর্নীতি বাড়ছে, তারই পরিণামস্বরূপ অন্য দেশেও লোভ ঈর্ষা আর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নেই এই সত্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা এখনও বোঝেন নি।

দরিদ্র দেশের জীবনযাত্রার মান অবশ্যই বাড়াতে হবে। সকলের জন্য যথোচিত খাদ্য বস্ত্র আবাস চাই, শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত মাত্রার চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও চাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানচর্চা একান্ত আবশ্যক। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসকল যদি অহিংস না হয়, নিজ দেশ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু অস্ত্রের বাহুল্য আর বিলাসসামগ্রীর বাহুল্য দুটোই মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর এই কথা মনে রাখা দরকার।

পৃথিবীতে বহু বার প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। নূতন পরিবেশের সঙ্গে যে সব মানুষ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পেরেছে তারা রক্ষা পেয়েছে, যারা পারে নি তারা লপপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের বৃদ্ধির ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব পড়ছে, তার জন্যও পরিবেশ বদলাচ্ছে। মানুষ এমন দূরদর্শী নয় যে তার সমস্ত কর্মের ভবিষ্যৎ পরিণাম অনুমান করতে পারে। বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাপক ভাবে যে সব লোকহিতকর চেষ্টা হচ্ছে তার ফলেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যদি দুর্ভিক্ষ শিশুমৃত্যু এবং ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধি নিবারিত হয়, প্রজার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট জন্মনিয়ন্ত্রণ না হয়, তবে জনসংখ্যা ভয়াবহরূপে বাড়বে, প্রজার অভাব মেটানো অসম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে এখনও কিছুকাল ক্রমবর্ধমান মানবজাতির খাদ্য ও অন্যান্য জীবনোপায়ের অভাব হবে না এমন আশা করা যেতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না, মানুষ সকল ক্ষেত্রে অনাগতবিধাতা হতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থ ছিল — ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। সংসারী মানুষের পক্ষে এই চারটি বিষয়ের সাধনা শ্রেয়স্কর বিবেচিত হ'ত। বর্তমান কালে বিজ্ঞান পঞ্চম পুরুষার্থ তাতে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের অবহেলার ফলে ভারতবাসী দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করেছে, এখন তাকে সযত্নে সাধনা করতে হবে। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক — কোনও নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রয়োগের পরিণাম দূর ভবিষ্যতে কি রকম দাঁড়াবে তা সকল ক্ষেত্রে অনুমান করা অসম্ভব। ডাক্তার বেন্টলি বলে গেছেন, বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার বিস্তারের কারণ রেলপথের অসতর্ক বিন্যাস। পেনিসিলিনে বহু রোগের বীজ নষ্ট হয়, কিন্তু দেখা গেছে অসতর্ক প্রয়োগে এমন জীবাণুবংশের উদ্ভব হয় যা পেনিসিলিনে মরে না। ডি-ডি-টি প্রভৃতি কীটঘ্নের ক্রিয়া প্রতিরোধ করতে পারে এমন মশক-বংশও দেখা দিয়েছে। বিকিনিতে যে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছিল তার ফলে বহুদূরস্থ জাপানী জেলেরা ব্যাধিগ্রস্ত হবে এ কথা মার্কিন বিজ্ঞানীরা ভাবতে পারেন নি। মোট কথায় বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগে যেমন মঙ্গল হয় তেমনি নিরঙ্কুশ প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে সুফলের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ফলও দেখা দিতে পারে।

১৩৬২

পরশুরাম গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড [এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড] চতুর্থ সংস্করণ।

ভূত আর আমরা

ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থা-র প্রকাশনা যন্ত্রস্থ

সংগঠন সংবাদ

বড়জাগুলি আঞ্চলিক গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব

১৩ ডিসেম্বর রবিবার দ্বিতীয় বার্ষিক বড়জাগুলি আঞ্চলিক গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব বড়জাগুলি গোপাল অ্যাকাডেমির খেলার মাঠে (কালিবাজার) হলো। উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বঙ্কিম ঘোষ, প্রধান অতিথি সোমা বিশ্বাস।

অনীশ সংস্কৃতি পরিষদ; একাদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মুক্তচিন্তা সম্মেলন আয়োজিত হয় ২৯ নভেম্বর ২০০৯ রবিবার। ৫/৫ বিটি রোড, ডানলপ ব্রিজ বেলঘরিয়া থানার বিপরীতে। মুক্তচিন্তার অগ্রদূত প্যারীচাঁদ মিত্রের স্মৃতিবিজড়িত অঙ্গনে।

আমাদের বেহিসেবি শক্তি খরচে বিপদে পড়বে উত্তর প্রজন্মই

সুজয় বসু

প্রথম অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার বিষয় হিসাবে আমি বেছে নিয়েছি এমন এক বিষয়, যা নিয়ে এখুনি ভাবনা চিন্তা শুরু করা দরকার। বিষয়টা হল —

শক্তির ব্যবহার ও সামাজিক সাম্য। প্রতিদিনই আমাদের শক্তি ব্যবহার করতে হয়, যে কোনো কাজেই। জীবন ধারণ করতে গেলে, শরীরটাকে সবল রাখতে, শক্তি ব্যবহার করতেই হয়। আর এই শক্তির ব্যবহারের মাত্রা গোটা বিশ্বে দিনে দিনে বাড়ছে। বাড়বেই। তার অন্যতম কারণ জনসংখ্যা বাড়ছে। সেই সঙ্গে জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আমরা সদা সচেষ্ট। জীবনযাত্রার মান সারা পৃথিবীতেই যা ছিল, তার থেকে বাড়ছে। এই মানটা যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে, সেটা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতেও থাকবে। দিনে দিনে শক্তির ব্যবহারের মাত্রা বেড়েছে। কিন্তু বর্তমানে সেটা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, তাতে শক্তির জোগান কতদিন দেওয়া যাবে এ নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার হয়, তার মাত্রার তারতম্য আছে। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শক্তির ব্যবহারের মাত্রা স্বভাবতই কম। তৃতীয় বিশ্বের এমন কিছু কিছু দেশ আছে, যেখানে প্রথম বিশ্বের তুলনায় শক্তির ব্যবহার এতই কম, যে কীভাবে তারা বেঁচে থাকছে, সেটাই বিস্ময়ের। উদাহরণ দিয়ে বলি, আমরা যে শক্তি ব্যবহার করি তার বিভিন্ন একক ঠিক করা হয়েছে। আমরা ক্যালরি জানি, জুল জানি, মেগাওয়াট জানি। এ ছাড়াও একটা একক আমরা ব্যবহার করে থাকি, তাকে বলে 'তেল-সম'। এক কিলোগ্রাম তেল যদি পোড়ানো হয়, তাহলে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে, তাকে বলব এক কিলোগ্রাম তেল-সম। বিভিন্ন দেশে যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে, সেটাকে আমরা তেল-সম দিয়েই চিহ্নিত করেছি। এখন আমাদের কাছে যে হিসেবটা আছে সেটা ২০০৭ সালের। ২০০৯ সালের সমস্ত তথ্যাদি জোগাড় করে সারণি তৈরি করতে আরও বছর দুই লেগে যাবে। ২০০৭ সালের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকাতে মাথাপিছু শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৭৭৫০ কিলোগ্রাম তেল-সম। আমি সারণি ঘেঁটে দেখেছি, ২০০৭ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু শক্তির ব্যবহার ছিল মাত্র ১৬০ কিলো তেল-সম। এই ১৬০ কিলো ব্যাপারটা আমাকে একটু ধন্দে ফেলেছিল। পরে আমি আগের বছরগুলোর সারণির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি, না, ভুল নেই। ওটা ১৬০ কিলোই। ভারতীয় উপমহাদেশের কথা বলি। ভুটানের তথ্য জানা নেই, ওটা তারা দেয়নি। ভারতীয়রা ব্যবহার করে ৫৩০ কিলো তেল-সম, পাকিস্তান ৫১০, নেপাল ৩২০, মায়ানমার ৩০০ কিলোগ্রাম। এই তথ্যটা দেওয়া হচ্ছে একটিই কারণে যাতে ফারাকটা বোঝানো যায়। এখানকার মানুষরা তো আছেনই, এমনকি বাংলাদেশের মানুষও যে খুব খারাপ অবস্থায় আছেন, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। ধনী দেশের কথা বাদ দিলাম, কারণ তারা তাদের জীবনযাত্রাকে একভাবে গড়ে ফেলেছে। এখন আর তাকে বদলানো ভীষণই কঠিন। মাথাপিছু সব থেকে বেশি তেল ব্যবহার করে তাতার। তা করারই কথা, কারণ তাতার তেলেরই দেশ। প্রচুর তেল পাওয়া যায়। তাই তারা সারা দিনরাত আলো জ্বালিয়ে রাখে। সত্যি বলতে কি ওরা যেটা করে, বেশিটা অপচয়ই করে। ওরা মাথাপিছু ব্যবহার করে ৫০০-১০০০ কিলোগ্রাম তেল-সম। কানাডা একচু বেশি করে। কারণ ওটা ভীষণ শীতের দেশ। নিজেদের গরম রাখার জন্যও ওদের অনেকটা শক্তি খরচ করতে হয়। আমরা ওদের বেশি শক্তি খরচের ব্যাপারটা আমরা তাই মেনে নিতে পারি। আমরা, যারা নিরক্ষীয় অঞ্চলে থাকি, যাদের ঘর গরম রাখতে

অত শক্তি লাগে না, অনেক কম শক্তি খরচ করে চলতে পারি। আমার বিশ্বাস, আমরা এখন যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করি এবং তার জন্য যত শক্তি ব্যবহার করি, চাইলে আমরা তার চেয়ে অনেক কম শক্তি ব্যবহার করতে পারি। আবার বাংলাদেশের তুলনা টানি, ওদের যেখানে মাত্র ১৬০, আমাদের ৫৩০। মানে তিন গুণেরও বেশি। আমাদের দেশের গ্রামীণ জীবনযাত্রার যা মান, আমার মনে হয়, তার সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানের খুব একটা ফারাক নেই। তাহলে এই বিরাট ফারাকটা কোথা থেকে হল? কোথায় ১৬০ আর কোথায় ৫৩০! এই যে ৩০ শতাংশ লোক আমরা শহরবাসী, আমরা প্রচুর পরিমাণে শক্তি ব্যবহার করি। সেটা আমরা আমাদের জীবনযাত্রার ভেতরে নিয়ে নিয়েছি। এটা আপনারা নিশ্চিতভাবেই জানবেন যে, একজন গ্রামবাসী একজন শহরবাসীর তুলনায় এক তৃতীয়াংশ শক্তি ব্যবহার করেন। এবং করে তাঁরা অসুস্থ নেই। আসলে জীবনশৈলি যেটা, সেটাকেই আমরা ঠিকমতো নির্ণয় করে উঠতে পারি নি, পারছি না। এই কথাগুলো বলা হল, আমরা কতটা শক্তি ব্যবহার করি, সে সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে। এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা দরকার, এই শক্তিগুলোর উৎস তাহলে কোথায়! এটা সকলেরই জানা যে, তেল, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের প্রয়োজনের সিংহভাগ মেটায়। তাছাড়া জলবিদ্যুৎ আছে। আমরা জৈবভর ব্যবহার করি। জৈবভর মানে, যা কিছু জ্বলানি আমরা দেখি, তাকেই জৈবভর বলে। এ ছাড়া আমাদের সামান্য কিছু পারমাণবিক শক্তি আছে। এই শক্তিগুলোকে সকল ভারতবাসীর কাছে আমরা ঠিকমতো পৌঁছে দিতে পারছি কিনা, এমন প্রশ্ন উঠলে বলতে হয়, না, পারছি না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ওই যে গ্রামে সত্তর শতাংশ মানুষ বাস করেন, তাঁরা বাঁচেন কী নিয়ে? তাঁরা বাঁচেন অবাণিজ্যিক শক্তি নিয়ে। অবাণিজ্যিক শক্তি বলতে বোঝায়, তাঁরা নিজেরা যা সংগ্রহ করতে পারেন তাই। আর তাই দিয়েই তাঁরা জীবন কাটান। এ নিয়ে একটা সমস্যা ঠিক নয়, একটা ধাঁধা আছে। যেমন ধরুন, এই যে জাতীয় আয়ের কথা বলি, আমেরিকার ক্ষেত্রে যেটা ১২ ট্রিলিয়ন ডলার পেরিয়ে গিয়েছে। ট্রিলিয়ন মানে, একের পরে ১২টা শূন্য। আমেরিকার পরে যারা সবথেকে বেশি ধনী, যেমন জাপান, তাদের জাতীয় বার্ষিক আয় চার ট্রিলিয়ন ডলার। ট্রিলিয়ন ডলারের অংশটা বাদ দিন। আমেরিকা ১২ তারপরে জাপান, তার চার! আমরা এখনো এক বিলিয়নে পৌঁছতে পারি নি। এক হাজার বিলিয়নে এক ট্রিলিয়ন হয়। সেদিক থেকে ধরতে গেলে, আমরা আমেরিকার তুলনায় চার হাজার গুণ গরিব। কাজে কাজেই আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করে কোনো লাভ নেই। তারাই বা এগুলো কতদিন চালাতে পারবে, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। অবাণিজ্যিক শক্তির কথায় আসি। আমরা নিরক্ষীয় অঞ্চলে বাস করি। এখানে অবাণিজ্যিক শক্তি প্রচুর। তার বিভিন্ন রকম। উদ্ভিদ থেকেই আমরা অবাণিজ্যিক শক্তি সংগ্রহ করে নিতে পারি। অন্যান্য দেশে এ ব্যাপারে অসুবিধে আছে, তাই তারা বাণিজ্যিক শক্তিগুলোকেই ব্যবহার করে। এ ব্যাপারে বর্তমানে শীর্ষে হচ্ছে তেল। সাধারণভাবে পৃথিবীতে যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহৃত হয়, তার ৩৫ শতাংশই আসে তেল থাকে। কয়লা ২৫ শতাংশের মতো। তেল যতটা সহজে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, কয়লার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা আছে। তাছাড়া আমরা যাকে শক্তির ঘনত্ব, মানে 'এনার্জি ডেনসিটি', বলি তা কয়লার চেয়ে তেলে দ্বিগুণ। অর্থাৎ এক কিলো তেল থেকে আমরা যে পরিমাণ শক্তি পাই, তা কয়লা থেকে পেতে গেলে, আমাদের দু কিলো কয়লা পোড়াতে হবে। মানে ঘনত্বটা অর্ধেক হয়ে গেল। পরিবহনের সমস্যাটা কয়লার ক্ষেত্রে বেশি। তাই কয়লার ব্যবহারটা কম, ২৫ শতাংশের মতো, আর গ্যাসের পরিমাণ হচ্ছে২০ শতাংশের মতো। সব মিলিয়ে আমরা জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করি ৮০ শতাংশের মতো। এখন অবশ্য আশি শতাংশেরও ওপরে উঠেছে। ১৯৭৩ সালে যখন প্রথম তেলের দাম আগুন হয়ে ওঠে, যাকে বলি 'ফার্স্ট ফায়ার শক'। সেই ১৯৭৩ সালে এই জীবাশ্ম জ্বালানির হার ছিল ৮৬.১ শতাংশ। তারপর থেকে এই ২০০৭ সাল, এতদিনে আমরা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে পারি নি। ৮০ শতাংশের নীচে নেমেছিল ২০০০, ২০০১, ২০০২ সালে। এখন সেটা ৮০ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে ২০০৭-এ। মনে হয় আরও বাড়বে। এই যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের শুরুর কথা বলতে গেলে আমাদের একটু ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। কারণ, এখানে একটা সাম্যের ব্যাপার আছে। শক্তি সংগ্রহ করতে গিয়ে সেই সামাজিক সাম্যটাকে অসম্ভব রকমের নিপীড়ন করেছিলাম। নিপীড়নের চেয়ে বলা ভালো, তাকে আমরা অনেকখানি দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছিলাম। এ কথা মনে রাখা দরকার এই কারণে যে, আমাদের সামনের দিনগুলো খুব একটা ভালো নয়। আগামী দিনগুলোতে এই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার নিয়ে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়তে হবে। হয়ত ১০-১৫ বছরের মধ্যেই কয়লা জ্বালানোটা একদমই বন্ধ করে দিতে হবে। এখনও পর্যন্ত যা আছে, আমরা কয়লা জ্বালিয়ে যাচ্ছি। আরও হয়ত দশ-বিশ বছর যাবে। কয়লা যখন প্রথম আসে। এই আসার কথা বলতে গেলে আমাদের কথা বললে হবে না। কারণ আমাদের দেশ ঠিক শিল্পোন্নত দেশ নয়। একথা ঠিক, আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে ভারতবর্ষে জীবনযাত্রার মান যা ছিল, সেটা পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গায় ছিল না। আমেরিকা হয়নি তখনও। ইউরোপবাসী যারা, তারা তখনও সভ্য হন নি। তা আমরা শক্তি নিয়ে ঠিক অতটা বাড়াবাড়ি করিনি। আমাদের দেশটা নিরক্ষীয় অঞ্চলে হওয়ার জন্য শক্তি সহজলভ্য। ইংল্যান্ড

থেকেই শিল্পযুগের সূচনা বলা হয়। তবে কয়লার ব্যবহার কিন্তু তার অনেক আগের। খ্রিষ্টের জন্মের তিনশো-সাড়ে তিনশো বছর আগেও কয়লার ব্যবহার ছিল। শুধু জ্বালানি হিসাবে নয়, এমনও প্রমাণ আছে যে, কয়লা থেকে গ্যাস তৈরি করে তা দিয়ে ঘর-গেরস্থালির আলো জ্বালানো হত। ইউরোপে কয়লা ব্যবহার শুরু হয় অনেক পরে। কয়লা তোলার প্রথম সরকারি অনুমতি দেওয়া হয় ১২৩৮ সালে। কিন্তু কয়লা তোলার যে প্রক্রিয়া, তা চালু করতে আরও একশো দুশো বছর কেটে যায়। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে কয়লার ব্যবহারটা খুব বেশি। কয়লা তোলার জন্যও শক্তির দরকার, না হলে তোলা যায় না। এতদিন ধরে শক্তিটা কে জুগিয়েছে! না, ইউরোপে এক হাজার বছরের ইতিহাস যদি ধরি, তাহলে প্রথম ছশো বছর, ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি শক্তি জুগিয়েছে কাঠ, জল এবং বাতাস। ব্যাপক পরিমাণে কাঠ ব্যবহার করা হত। এবং জলচক্রের সাহায্যে বিভিন্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থাদি চালু রাখা হত। বায়ুচক্র ছিল। বায়ুচক্র দিয়ে জল তোলা হত। শুধু জল তোলাই নয়, আরও অনেক রকম কাজই বায়ুচক্র দিয়ে করা হত। এতে খুব একটা অসুবিধে হয় নি। যদি পরিবহনের কথাই ধরা যায়, তখন মূলত ঘোড়ায় টানা শকট মানে ঘোড়ার গাড়ি চলত। বলদে টানা গাড়িও ছিল। তারপর দেখা গেল সেগুলোতেও কিছু অসুবিধে আছে। নৌকো তার অনেক আগে থাকতে চলছে। তখন নৌকো ব্যবহার শুরু হল। খুব খুব ভালো ভালো কাঠ দিয়ে নৌকো তৈরি হত। ধরা যাক, চারটে ঘোড়া, তার সঙ্গে আটটা লোক যে পরিমাণ বহন করতে পারত, সে তুলনায় একটা নৌকো আর একটা লোক তার থেকে দশ গুণ মাল বয়ে নিয়ে যেতে পারত। তখন নৌকোর গুণ টানা হত। নদীর ধার দিয়ে নৌকো যাওয়ার আলাদা রাস্তাই ছিল। প্রায় পাঁচ-ছশো বছর এই ব্যবস্থাটা চলেছে। এবং খুব যে খারাপ চলেছে, তা একেবারেই নয়। এর ভেতর অনেক রাজা সম্রাট উঠেছেন। তাঁরা অস্ত গিয়েছেন। এইভাবেই জীবন চলেছে। কৃষি ভালো ছিল। কৃষি পরিবহনও ভালো হত। বনজঙ্গল থেকে কাঠ কাটা হত, সেগুলো পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল। সব মিলিয়ে জীবনযাত্রার মান খুব একটা খারাপ ছিল না। ইউরোপের সেই কালের তুলনায় আমাদের দেশের জীবনযাত্রা একইরকম সহজ ছিল। আমাদের যানবাহন হিসাবে গরুর গাড়ি ছিল, ঘোড়া ছিল। নৌকো তো ছিলই। সেই নৌকো ছিল বিভিন্ন মাপের, বিভিন্ন গতির। বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য নৌকোগুলোকে আলাদা করে তৈরি করা হত। কয়লা আসার পর কয়লা তোলা শুরু হল। কিন্তু তাতে এক সমস্যা — জল জমে যায়। সেই জল পাম্প করে তুলতে হবে। ১৭৬০-এ স্টিম ইঞ্জিন আসার পর তার সাহায্যে জল তোলা হতে লাগল। কয়লা ব্যবহার করতে করতে তাঁরা তখন ধাতুর দিকে গেলেন। প্রথম দিকে কয়লার ব্যবহার ছিল কল-কারখানায়। কল-কারখানা তখন সামান্যই ছিল ইউরোপে। একটু পেছনে তাকালে দেখা যায়, পঞ্চদশ শতাব্দীতে তবু ইংল্যান্ডে সুতোকল মানে মিল তৈরি হয়েছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে সেখানে ছোট ছোট কল-কারখানা হয়েছে। বড় কিছু হয়নি। তখন যে সব সুতোকল ছিল, তাতে শ্রমিক ছিল নগণ্য। মানে প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কলগুলো চলত। শ্রমিকদের কাজ ছিল কোথাও কোনো বিচ্যুতি ঘটলে শুধরে দেওয়া। বিচ্যুতি বলতে, ধরা যাক সুতোটা ছিঁড়ে গেল। সে তখন সেই সুতোটা আবার বেঁধে দিত। বেঁধে দিলে আবার যন্ত্র ঠিকমতো চলতে শুরু করত। এর জন্য বয়স্ক লোকেরও দরকার হত না, পুরুষ, নারী, এমনকি শিশুরা হলেও চলত। ইংল্যান্ডের এই যে সময়টা, এই সময়ে কয়লার ব্যবহার হত প্রচুর। আর দহন-প্রক্রিয়াটা উন্নত না হওয়ায় চতুর্দিক কালো ধোঁয়ায় ভরে যেত। এইটা বহুকাল ধরে চলেছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে শেষ হয়েছে এমন নয়। এই সময়টাকে আমি বলি কালা সময় বা খারাপ সময়। এটাকে ইউরোপের কৃষ্ণকালই বলা চলে। তিনটে শতাব্দী জুড়ে চলেছে এই কৃষ্ণকাল। এই সময়ে মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলে। আজকে ব্রিটিশরা নিজেদের সুসভ্য বলে দাবি করে। কিন্তু ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার লেশমাত্র ছিল না। শ্রমিক হিসাবে বাচ্চারাও কাজ করত। এক গবেষক দেখিয়েছেন, এক-একজন শিশু শ্রমিকের কাজের সময় ছিল ১২ থেকে ১৫ ঘণ্টা। সারাদিনে তাদের প্রায় ১৫ মাইলের মতো ছুটতে হত। একটা সুতো ছিঁড়ে গেছে, দৌড়ে গিয়ে তাকে আটকে দিতে হবে। এই শ্রমিকরা সস্তার এবং অদক্ষ। আর শ্রমিকের অভাবও হত না। কল-কারখানার কাছে যে সব শ্রমিক থাকতেন তাঁদের জীবনযাত্রার মান ছিল খুব খারাপ। তাঁদের বিনোদনের কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। সেখানেই তাঁদের ছেলেমেয়ে হত। ছেলেমেয়ে হলেও তাঁরা খুব একটা আটকানোর চেষ্টা করতেন না। কারণ এই ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলে কিছু রোজগার করতে পারবে। একটা কথা শুনলে হয়ত বিশ্বাস হবে না, ইংল্যান্ডে একটা সমিতি এঁদের জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিল। শ্রমিকদের এই যে ধারাবাহিক কষ্ট, তার থেকে তাঁদের মুক্তির কোনো উপায় ছিল না। একজন, তার পুত্র, প্রপৌত্র — সবাই শ্রমিক হিসাবেই কাটাবেন। সেই কারণেই জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ। কিন্তু মিল-মালিকেরা তা নিয়ে তীব্র আপত্তি তোলে। কারণ এতে তাদের শ্রমিকে ঘাটতি হবে। শ্রমিকদের দুর্দশার বিবরণ অনেকের বইতেই পাওয়া যায়। চার্লস ডিকেন্সের লেখাতে আছে।

শিক্ষাব্যবস্থা যেটা ছিল, সেটা না থাকারই মতো। তারা যাতে নির্দেশগুলো পড়তে পারে, সেটুকু বিদ্যা অর্জনের জন্য একটা বিদ্যালয় থাকত। সে বিদ্যালয় ওই রকমই ছিল। সে সময়ের ওপরক লেখা উপন্যাস পড়লেই ব্যাপারগুলো জানা যায়। সময়টা

ছিল ভীষণ, ভীষণ খারাপ। এই সময়টা আরও খারাপ হল, যখন লোহা-ইস্পাতের চল হল। প্রথমে লোহার আকর ছিল। লোহা গলিয়ে বার করতে গেলে প্রচুর তাপশক্তির দরকার। কাঠ পুড়িয়ে ওই উত্তাপটা দিতে হত। কয়লা আসার পরে, কয়লাই ব্যবহৃত হতে থাকে। কারণ কয়লা থেকে আরও বেশি তাপ পাওয়া যায়। তখন থেকে ধাতুর জিনিসপত্র, মানে লোহার জিনিস তৈরি শুরু হয়। কিন্তু ইস্পাত গলাতে গেলে অনেক তাপের দরকার, প্রায় ১৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুধু কয়লা জ্বালিয়ে তা পাওয়া যায় না। তার জন্য দরকার জোরালো বাতাস। সেই প্রবল জোরালো বাতাস দেওয়া হত জলচক্র বা বায়ুচক্রের সাহায্যে। আমরা 'ব্লাস্ট ফার্নেস' কথাটার সঙ্গে পরিচিত। এই ব্লাস্টটা হচ্ছে ওই বাতাস। বাতাস না দিলে তাপমাত্রা উঠবে না। লোহা, লোহার পরে ইস্পাত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে পাওয়া গেল ইস্পাতের রেল। এই রেলটা অবশ্য প্রথম ব্যবহৃত হত কয়লা তোলার কাজে। ছোট ছোট ট্রলিতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত কয়লা। প্রথমে অবশ্য পুরো পথটা রেলের ছিল না। কাঠের ওপর লোহার পাত রাখা হত, যাতে ক্ষয়টা কম হয়। জেমস ওয়াট স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সেই ইঞ্জিন ছোট ছোট গাড়ির সঙ্গে জুড়ে তাকে রেলের ওপর বসিয়ে চালানোর ব্যবস্থা করা হয়। এইবাবে চালু হয় রেলগাড়ির। রেলগাড়ি চালুর সময় অনেক মজার মজার ঘটনা ঘটেছিল। সাধারণ লোক এর বিরোধিতা করেছিল। বলেছিল, এটা বিপজ্জনক। এটা সত্যিই বিপজ্জনক ছিল। কারণ কয়লা জ্বলার সময় ফুলকি উড়ত আর সেই ফুলকি থেকে আশেপাশের বাড়িতে আগুন ধরে যেত। তারপরে গাড়ি তেমন জোরেও চলত না। ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে প্রতিযোগিতাও হয়েছিল। এসবের মধ্যে দিয়েই রেল আসে। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের যে দশক তাকে রেলের দশক বলা হয়। আমাদের দেশে রেল খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল। এর জন্য ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগ ছিল অনেকখানি। এর পেছনে যে মহান কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল কোথাও বিদ্রোহ হলে সেখানে দ্রুত সৈন্য পাঠানো। মালপত্র পরিবহনের যে রেল, তখন তার খুব একটা প্রচলন ছিল না। রেলের ইঞ্জিনের মতো বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি চালানোয় কয়লার ব্যবহার হত। তাছাড়া কয়লার ব্যাপক ব্যবহার হত ধাতুশিল্পে। তখন ইংল্যান্ডে কয়লা পুড়িয়ে পুড়িয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। স্মগ, মানে ধোঁয়াশার জন্য মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়াও কষ্টকর ছিল। তখন ব্রিটিশ সভ্যতা অনেক ঊর্ধ্বগামী। তা সত্ত্বেও এরকমটি ঘটেছে। আমাদের কয়লার ব্যবহার অনেকদিন থেকেই চলছে। কিন্তু তার ব্যাপক ব্যবহার যান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোয় এসেছে অনেক পরে। ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই এগুলো নিয়ে এসেছিল। আমাদের দেশে ইস্পাত শিল্প প্রথম গড়ে ওঠে জামসেদপুরে। পরে অন্যান্য প্রদেশেও গড়ে ওঠে। যার ফলে শক্তির চাহিদা বেড়ে যায়। আর এই চাহিদা কয়লাই পূরণ করেছে। তারপরে তেল আসে। তেল এসে কয়লার চাহিদা অনেকটাই কমায়। এর প্রধান কারণ তেলের শক্তির ঘনত্ব বেশি। কিন্তু তেলের আমদানি ততটা ছিল না। তেলের ব্যবহার বাড়ার ফলে উৎপাদনও বাড়ে। এই ব্যবহার বাড়ে মোটর গাড়ির ইঞ্জিন যাকে ইন্টারনাল কমবাশন ইঞ্জিন বলে, ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে। নক লাউস, অটো, বেনৎ ডেমিলার — এরাই জার্মানিতে প্রথম অটোগুলো তৈরি করেছে। তারপর এগুলো ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়। আর জনপ্রিয় হতে হতে বিংশ শতাব্দী এসে যায়। এতে তেলের ব্যবহারও ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। ১৯১৫ সালের পরে হেনরি ফোর্ড তাঁর কারখানায় মিনিটে একটা করে গাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেন। এটা চলতে চলতে এখন আরও ব্যাপক আকার নিয়েছে। ফলে শক্তির ব্যবহারও সেই অনুপাতে বেড়েছে। সেটা বেড়েছে একটাই কারণে, তা হল নতুন যুগের সূচনা। এই নতুন যুগ বলতে বোঝায় বিদ্যুৎ ও তার পরে বৈদ্যুতিন শক্তি। বিদ্যুতের ব্যবহার শুরুর আগে নানা আবিষ্কারটাবিষ্কার হয়েছে। তারপর ১৮৮২ সালে টমাস আলভা এডিসন ইংল্যান্ডের লন্ডনে এবং আমেরিকার নিউইয়র্কে প্রায় একই সঙ্গে দুটো বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র তৈরি করেন। সেই সূচনা। ১৮৯৫ সালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে। ইউরোপেও খুব একটা পিছিয়ে থাকে না। এটা প্রায় সবারই জানা যে, নরওয়ে তার মোট ব্যবহৃত শক্তির ৯৫ শতাংশই পায় জলশক্তি থেকে। বিদ্যুতের ব্যবহার জীবনযাত্রার মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনে, ব্যবহারও বাড়ে। ফলে শক্তির যা প্রয়োজন তাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। বেড়ে এখন যে অবস্থায় এসেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে অনায়াসে বলা যায় যে, এটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

সামাজিক সাম্যের প্রসঙ্গটা বাংলাদেশ ও ভারতের উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। বাংলাদেশ যেমন মাথাপিছু ১৬০ কিলোগ্রাম তেলে চালায়, আমাদের খরচ হয় ৫৩০ কিলোগ্রাম। অথচ ভারতের অধিকাংশ লোক যে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বা বাধ্য হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের জীবনযাত্রা কিন্তু একইরকম। তাহলে আমাদের দেশে মাথাপিছু শক্তির ব্যবহার এত বেশি হওয়ার কারণ কী, এই প্রশ্নটা ওঠে। এটা বেশি যে ৩০ শতাংশ শহরবাসী, তাদের জন্য। ইংল্যান্ডে বহুদিন আগে একটা সমীক্ষা হয়েছিল, তাতে দেখা গেছে, যাদের সপ্তাহে ১০ পাউন্ড রোজগার, আর যারা সপ্তাহে ৬০ পাউন্ড রোজগার করে। অর্থাৎ ছ গুণ বেশি, তাদের জীবনযাত্রায় শক্তির ব্যবহার কীরকম হয়। তাতে তাঁরা দেখেছেন, জ্বালানি শহরবাসী দু গুণ বেশি ব্যবহার করে,

খাবার একটু বেশি, তিনগুণ। অন্যান্য জিনিসপত্র ছ গুণের মতো। কিন্তু তাঁদের মূল উপভোগ্য যা, তা হচ্ছে মদ আর তামাক। সেখানে তাঁরা আটগুণের বেশি খরচ করেন। আর যাতায়াতের জন্য ১৭ গুণের বেশি খরচ করেন। অর্থাৎ আমার যদি আয় ছ গুণ হয়, তবে আমি তার তিন গুণ যাতায়াতে খরচ করি। এই যাতায়াতে খরচ বলতে অবশ্যই শক্তির খরচ। কারণ শক্তি ছাড়া যাতায়াত হয় না। এর কি খুব একটা প্রয়োজন আছে? উত্তর হবে — না। আমরা যে শক্তি ব্যবহার করি তার একটা অংশের ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু অনেকটা অংশ আমরা উপভোগের জন্য ব্যয় করছি। আর ইদানীংকালে সেই উপভোগের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কাজেই একদিকে যাদের নেই, তাদের নেই-ই। এবং যাদের আছে তারা কোটিপতি। এই কোটিপতি মানে মিলিওনেয়ার নয়, বিলিওনেয়ার। এই কোটিপতিদের সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছে। কাজেই একটা বৈষম্য যে তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। এটা নিয়ে যদি অনুসন্ধান বা গবেষণা করার সুযোগ থাকে, তাহলে আমরা দেখব, শক্তির খরচটা বেশি হচ্ছে, তা সত্যিকারে কোথায় হচ্ছে! এই যে গাড়িগুলোর চল হয়েছে, আমেরিকায় প্রথম যখন গাড়ির চল হয়, তখন একজন অধ্যাপক খুব চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আমরা এই গাড়িগুলোকে রাস্তায় রাখার জন্য ৩০ হাজার প্রাণ বছরে বলি দিচ্ছি। দুর্ঘটনায় আহত নয়, মারা যাচ্ছেন ৩০ হাজার! এ রকম বাহনের কি আমাদের দরকার আছে!' সম্প্রতি আমাদের কলকাতা শহর ও শহরতলিতে যত মোটর দুর্ঘটনা হয়েছে, যতজন মারা গেছেন, তাতে আমাদের এবার প্রশ্ন করার সময় এসেছে, সত্যিই কি এগুলোর আমাদের প্রয়োজন আছে!

শক্তির ব্যবহারের যে বৈষম্য, তা নিঃসন্দেহে আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদরা যে অর্তনীতির চর্চা করেন তা মূলতভিত্তিক অর্থনীতি, কিন্তু সমাজভিত্তিক অর্থনীতির চর্চা খুব দরকার। আমাদের দেশের গরিব মানুষেরা তাও বেঁচে আছেন। এই যে আদিবাসীদের দেখছেন, তাদের শক্তির জোগান নেই, খাদ্য নেই, প্রায় কিছুই নেই।

খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমরা কতটা শক্তি ব্যয় করি, কতটা শক্তি দরকার। আমেরিকায় ১৯১০ সালে মোটামুটিভাবে এক ক্যালরি শক্তি খরচ করলে, ১ ক্যালরির মতো খাদ্য পাওয়া যেত। কিন্তু এখন তারা সেটাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে, মানে চাষবাসকে যান্ত্রিক করে ফেলেছেন। আমেরিকায় এখন মাত্র তিন শতাংশ লোক কৃষির সঙ্গে যুক্ত। তারা যাবতীয় কৃষিজ জিনিস উৎপন্ন করে। পুরো ব্যাপারটাই প্রায় সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছে। ফলে এখন তারা ৮ ক্যালরি থেকে দশ ক্যালরি শক্তি খরচ করে মাত্র এক ক্যালরি খাদ্য পায়। তারা যে শস্য উৎপাদন করে তার জন্য যে পরিমাণ শক্তি খরচ হয়, শস্য প্রক্রিয়াকরণের পর সেগুলো দোকানে এনে পরিবেশন করার স্তর অবধি, মানে প্যাকিংট্যাকিং সব ধরে — তাতে দেখা যায় মূল খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে শক্তি খরচ হয়েছিল এসবে খরচ তার চেয়ে বেশি। এই ব্যবস্থাটা তারা চালিয়ে আসছে। আমাদের দেশেও ইদানীংকালে ভীষণ প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এটাকে রক্ষা করা কতদূর সম্ভব হবে জানি না! তাহলে আমাদের দেশের লোক, বাংলাদেশের লোক বাঁচেন কী করে! আমাদের যে শস্য উৎপাদন, সেখানে যে শক্তির ব্যবহারটা আশ্চর্য রকমের কম। আমাদের এখানে ঝুম প্রথায় চাষ হয়। এটা ত্রিপুরায় গেলে খুব দেখা যায়। সেখানে অনেক ঝুম চাষী দেখতে পাওয়া যায়। ওরা বনের খানিকটা অঞ্চল পরিষ্কার করে পুড়িয়ে দেয়। পোড়া ছাইটা সার হিসাবে ব্যবহার করে। কোদল দিয়ে মাটি কুপিয়ে ধান বোনে। বৃষ্টি থেকে যে জল পাওয়া যায়, সেটাই তাদের সেচ। সেই ধান পাকলে কেটে নেয়। তা দিয়েই তাদের চলে। এই ঝুম চাষে তারা যে পরিমাণ শক্তি নিয়োগ করে, তার ৫০ গুণ শক্তি পায়, যে খাদ্য উৎপাদন করে তার তেকে। এই ঝুম চাষকে ইংরেজিতে বলে 'শিফটিং কাল্টিভেশন'। মানে ওই জায়গাটায় কদিন পরে উর্বরতা কমে যাবে, তখন তারা অন্য একটা জায়গায় যাবে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের সার আমদানি করা শুরু হয়েছে। এজন্য কিছু ভারতীয় বাইরের দেশ থেকে প্রচুর অভিনন্দিত হয়েছেন, পুরস্কৃতও হয়েছেন। কিন্তু তবু যে পদ্ধতিটা চালু করা হয়েছে আমি একবাক্যে তাকে ভুলই বলব। এও জানি, এর জন্য ভারতবাসীকে কিছু মূল্য দিতেও হবে। আমরা জলে ধান চাষ করি, তাতে যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করি, তার ১০-১৫ গুণ শক্তি আমরা ওই খাদ্য থেকে পাই। এটা আমাদের জীবনযাত্রার খুবই সহায়ক। এটা খুবই আনন্দের কথা, এখন কৃষিতে জৈবসার ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আমরা যে রাসায়নিক সার ব্যবহার করি, তাতে আপাতভাবে বেশি ফলন হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জমির উর্বরতা কমতে থাকে। এটাকে যদি ফিরিয়ে আনতেই হয় তবে এই চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। শেষে এইটুকুই বলা যায় যে, বড় গবেষকের দরকার নেই সাধারণভাবে আমরা যদি একটু তাকিয়ে দেখি, আমাদের যে আর্থিক বিন্যাস, তাতে সামাজিক বৈষম্য থাকবে। কিউবার মতো দু-একটা দেশে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। তবে একটা কথা হয়ত প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, আবহাওয়া পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত আসছে তাতে সমস্ত বিশ্ববাসীর ওপরেই একটা অসম্ভব রকমের চাপ পড়বে। খাদ্যাভাব ঘটবে, জলাভাব ঘটবে। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। পরে কোনোসময় এটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এ প্রসঙ্গে এটুকু বলা যায় যে, শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটো বাঁধন পড়বে, এক হচ্ছে, আমাদের শক্তির যে ভাণ্ডার তা নিঃশেষিত হয়ে আসছে। কয়লা তবু থাকবে, তেল থাকবে না। এটা মোটামুটি দায়িত্ব নিয়ে বলা যায় ২০৫০

সাল নাগাদ তেল অমিল হবে। আর কয়লা পোড়ানো যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী, কয়লা পোড়ানোর দরুন তৈরি হওয়া কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবেশনের সবচেয়ে ক্ষতি করে, তাই এর ব্যবহার তাতে কমবে। একজন জাপানি মনীষী একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন। এ নিয়ে 'সভ্যতার সঙ্কট'টাও পড়ে দেকা যায়। সেই জাপানি মনীষী বলেছেন, পৃথিবীটার বয়স যদি এক বছর হয়, তাহলে মানুষ সেখানে এসেছে ঘণ্টা দুয়েকও হয়নি। সভ্য মানুষ এসেছে গত এক মিনিটে, আর দূষণকারী মানুষ এসেছে এক সেকেন্ডে। আমাদের কি উচিত হবে, এই এক সেকেন্ডে যারা এসেছে, তাদের দ্বারা এই ক্ষয়ক্ষতি মেনে নেওয়া!

প্রথম অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

একটি প্রতিবেদন

২২ নভেম্বর 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা'-র আয়োজন করেছিল উৎস মানুষ। এবারই প্রথম এই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হল। উৎস মানুষ প্রতি বছর নভেম্বর মাসে 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা'-র আয়োজন করবে বলে ঠিক করেছে।

অনুষ্ঠানটি হল কলেজ স্ট্রীটের স্টুডেন্টস্ হলে। শুরুতেই নিরঞ্জন হালদার সারিন্দায় বিভিন্ন গানের সুর বাজান। পত্রিকার পক্ষ থেকে পারমিতা দত্ত একটি লেখা পড়ে শোনান। লেখাটির বিষয় 'আমাদের ভাবনা'। শ্যামল ভদ্র অধ্যাপক সুজয় বসুর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেবার পরই শুরু হয় 'শক্তি ব্যবহার ও সামাজিক সাম্য' বিষয় নিয়ে আলোচনা। অধ্যাপক বসু ঘণ্টাখানেক ধরে আলোচনা করেন। শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দেন বক্তা। এভাবেই অনুষ্ঠানটা শেষ হয়। শ্রোতাদের আগ্রহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে মানানসই ছিল।

অপ্রিয়

প্রতুল মুখোপাধ্যায়

অপ্রিয় কথা, তবু সন্দেহ নাস্তি।
মহানের মধ্যেও থাকে কিছু 'নাস্টি'।
নাস্টি কখনও যায় মহান্‌কে ছাড়িয়ে।
মহান কখনও দেয় নাস্টি-কে তাড়িয়ে।
নাস্টি-মহান্ দু'য়ে মিলেমিশে একাকার।
হ্যাজিঅগ্রাফার শুধু মহান্-এর লেখাকার।
শুধুই মহৎগুণ, শুধুই প্রশস্তি।
এতেই চরিতকার পেয়ে যান স্বস্তি।
দেখেন নাস্টি শুধু খুঁত-পরিদর্শক।
তাঁর বিবরণও হয় চিত্ত-আকর্ষক।
পাঠক ভাবেন, 'ছি, ছি, এত এত দোষ যাঁর,
তাঁর কাছে শিখবার নেই কোনো দরকার।
সবটাই জেনে নিতে সত্যিই দোষ নেই।
গ্রহণীয় কতখানি থাকো সেই প্রশ্নেই।
কাঁটাগুলো বাদ দিয়ে যেমনটি মাছ খাও,
বর্জনীয়কে ফেলে গ্রহণীয় বেছে নাও।
সব্‌জি ধুয়েই রাঁধো, জল খাও ফুটিয়ে।
সত্য সামনে দেখে কেন যাও গুটিয়ে?
দোষ তো নিজেরও থাকে, গুণ নেওয়া শক্ত।
হয়ে যাও মানুষের সদ্‌গুণভক্ত।

ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ :

nasty - নাস্টি - নোংরা।

hagiographer - হ্যাজিঅগ্রাফা(র) - সাধুসন্ত বা মহাপুরুষ - মহীয়সীদের জীবনকাহিনী - রচয়িতা।

উৎসশব্দ গ্রিক hagiographa; hagios = holy পুণ্য, পবিত্র graphein = to write লেখা

কল্পলোকের নায়ক গণপতি

সমীরকুমার ঘোষ

গত সংখ্যার পর

বোসের সার্কাস থেকে বেরিয়ে গণপতি নিজের দল গড়ে তুললেন। সে দল পুরোপুরি জাদু প্রদর্শনীর। সার্কাসের কয়েকজন শিল্পীও তাঁর দলে যোগ দেন। তাঁদেরই অন্যতম হলেন হিঙ্গনবালা। অসাধারণ সুন্দরী এই হিঙ্গনবালা সার্কাসে এক বড় বলের ওপর দাঁড়িয়ে ব্যালান্সিং বা ভারসাম্যের খেলা দেখাতেন। খেলাটি ছিল খুবই কঠিন। হিঙ্গনবালার নিপুণ প্রদর্শনে দারুণ জনপ্রিয়ও হয়েছিল। সার্কাস ছেড়ে তিনি সেই যে গণপতির সঙ্গী হন, আর কখনও গণপতিকে ছেড়ে যান নি। বন্ধনহীন এক সম্পর্কে আজীবন জড়িয়ে ছিলেন দুজনে।

এই হিঙ্গনবালার আসল নাম ছিল হরিমতী দাসী। তখনকার সময়ে সার্কাসে সুন্দরী শিল্পীদের নাম রাখা হত বিভিন্ন সুন্দরী বাইজিদের নামের অনুকরণে। বোসবাবু রূপে, গুণে, ব্যালেন্সের খেলায় দক্ষ বিস্ময়কর প্রতিভা হরিমতীর নাম রাখেন অসামান্য শিল্পী এবং ভাকসাইটে বাইজি হিঙ্গনবালার নামে। সুদর্শন, সুপুরুষ, সপ্রতিভ, বুদ্ধিমান এবং বিস্ময়-প্রতিভা গণপতির প্রতি সার্কাসের অনেক মেয়ে, মানে মুন্নী, সুলতানবালা আর সুকুমারীর নজর ছিল। প্রতিযোগিতায় সবাইকে পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন হরিমতী ওরফে হিঙ্গনবালা। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন সুশীলা সুন্দরীর।

গণপতির প্রতি সুন্দরীদের প্রবল আকর্ষণের সেই কাহিনী বলতে গেলে আবার ফিরে যেতে হয় সেই বোসের সার্কাসেই।

গণপতি যখন সার্কাসে খেলা দেখাতে সুরু করেন তখন সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল বাঘের খেলা। খেলাটি দেখাতেন কোনো পুরুষ নন, এক সুন্দরী মহিলা, নাম সুশীলা সুন্দরী। বাঙালি এই মেয়েটি মোটেই অবলা ছিলেন না। ওঁর যেমন ছিল সাহস তেমনই গায়ের জোর। শোনা যায়, পাঞ্জা এবং কবজির জোরে অনেক গোরা সৈনিকও তাঁর কাছে হার মেনেছিল। এই সুশীলাই ছিলেন সার্কাসের এক নম্বর শিল্পী। বাঘের খেলা যাঁরা দেখাতেন, তাঁদের হাতে চাবুক থাকত, কিন্তু অসমসাহসী সুশীলা খেলা দেখাতেন খালি হাতেই। বাঘকে জড়িয়ে ধরতেন, চুমু খেতেন। বাঘের সামনের পা দুটো তুলে ধরে নেচে দেখাতেন। তারপর বাঘের পিঠে মহারাণীর ভঙ্গিমায় হেলান দিয়ে শুয়ে অনুষ্ঠান শেষ করতেন। রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী পত্রিকায় (মাঘ ১৩১৫, স্বদেশী সার্কাস) লেখেন, 'একটি ক্ষুদ্র বালিকা নির্ভয়ে বাঘের মুখে চুম্বন করিতে লাগিল — বাঘটি

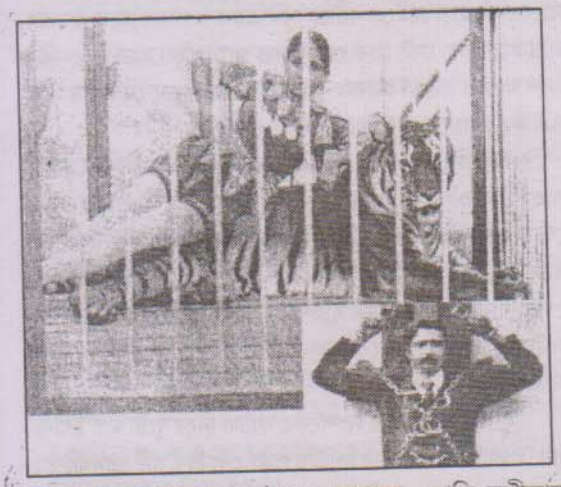

যেন তার পোষা কুকুর।' মেমসাহেবরাও নাকি সুশীলার দুঃসাহসিক কাণ্ড দেখে ভিরমি খেয়ে বারবার স্মেলিং সল্ট শুঁকে চেতনা জিইয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। বাঙালিদের প্রতি নাক-সিঁটকোনো ইংরেজি পত্রিকাগুলোও প্রশংসামুখর ছিল। কিন্তু একদিন কাটোয়া শহরে সেই বাঘের খেলা দেখাতে গিয়েই সুশীলা মারাত্মকভাবে জখম হন। দোষটা বাঘের না সুশীলার অন্যমনস্কতার, সে নিয়ে ঘোর বিতর্ক আছে।

দুর্ঘটনাটি ঘটে প্রায় একশো বছর আগে। পুরনো প্রশিক্ষিত বাঘটি হঠাৎ মারা যাওয়ায় নতুন একটি বাঘকে নিয়ে খেলা দেখাতে শুরু করেন সুশীলা, তার নাম ছিল ফরচুন। খুব ছোট বয়স থেকে না শেখালে বাঘকে দিয়ে খেলা দেখানো মুশকিল। ১৯১১ সালে এক পুরনো সার্কাস 'সীসন্‌স সার্কাস' কিনে এই ফরচুনকে পেয়েছিলেন বোসবাবু। বাঘটি তখন বেশ বড়। ওকে একটু-আধটু শিখিয়ে খেলা দেখানো হত, যাতে বাঘের খেলা বাদ না পড়ে। মাটিতে খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে গলায় শেকল বেঁধে খেলা দেখাতেন সুশীলা। প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে থাকতেন চাবুক হাতে। ঘটনাক্রমে দুর্ঘটনার দিন প্রিয়নাথ ছিলেন না, এদিকে ফরচুনের মেজাজও ছিল বিগড়ে। বাঘের বিভিন্ন খেলা সাবধানে সেরে যেই সুশীলা তার গায়ে হেলান দিয়ে শুয়েছেন, অমনি বাঘটা ক্ষেপে উঠে তাঁকে আক্রমণ করে। মাথায় থাবা দিয়ে মেরে তার ওপর চেপে বসে। দুজনে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। সুশীলার গায়ে বেশ জোর ছিল। তিনি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেও বাঘ আবার আক্রমণ করে। ঘাড় ও কাঁধের ওপর কামড়ে, থাবা মেরে ক্ষতবিক্ষত করে। সেদিন রিং মাস্টার ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দে। তিনি প্রাথমিক

হতভম্বতা কাটিয়ে চাবুক চালান। বাঘ তাঁকে আক্রমণ করতে যায়। কিন্তু গলায় শেকল বাঁধা বলে পৌঁছতে পারে না। এই সুযোগে সুশীলা মাটিতে গড়িয়ে কোনোক্রমে বাঘের নাগালের বাইরে চলে আসেন। তাঁকে প্রথম কাটোয়া হাসপাতাল ও পরে মেডিক্যাল কলেজের কর্ণেল বার্ডের তত্ত্বাবধানে ভর্তি করা হয়। বাঘের আঁচড়ে-কামড়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ক্ষত শুকোলেও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। বেশ কয়েক বছর বিছানায় কাটিয়ে ১৯২৪-এর মে মাসে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে মারা যান সুশীলা।

বাঘ-সিংহের খেলায় অসতর্কতা মানেই চরম বিপদ। দুর্দান্ত সাহসী, দক্ষ খেলোয়াড় সুশীলা অন্যমনস্ক হলেন কেন? পোড়ামাতার মন্দিরে খেলা দেখানোর জন্য দলের কয়েকজনের সঙ্গে সুশীলা গণপতির নামে বোসবাবুর কাছে নালিশ করেন। শোনা যায়, সুশীলার মনে ধারণা হয়েছিল গণপতির প্রতি তিনি অন্যায় অভিযোগ করেছিলেন, অপ্রত্যাশিত বাঘের থাবার আঘাতে তারই দৈবী ইঙ্গিত।

সুশীলা-গণপতির সম্পর্কের ফাটল নিয়ে দুটো মত শোনা যায়। প্রথমটি জনপ্রিয়তায় পিছিয়ে পড়া এবং দ্বিতীয়টি প্রেমঘটিত। বোসের সার্কাসে গণপতির যোগদানের আগে এবং প্রথম দিকে সুশীলার দুঃসাহসিক বাঘের খেলাই ছিল সেরা আকর্ষণ। গণপতি শুরুর দিকে সার্কাসের বিভিন্ন খেলার ফাঁকে ফাঁকে ম্যাজিক দেখাতেন। ম্যাজিকের দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ে বিশেষ করে কৌতুক অভিনয়েও তিনি ছিলেন অনবদ্য। মজাদার জাদুর খেলা দেখিয়ে দর্শকদের হাসাতে আর একই সঙ্গে তাক লাগিয়ে দিতে তাঁর জুড়ি ছিল না। জনপ্রিয় বোসের সার্কাসে অচিরেই অপরিহার্য হয়ে পড়েন গণপতি।

আর যেই তিনি বিখ্যাত ইলিউশন বক্স ও ইলিউশন ট্রি-এর খেলা শুরু করলেন, তাঁর জনপ্রিয়তার রেখচিত্র সবাইকে ছাড়িয়ে চলে গেল। তখন সুশীলার বাঘের খেলার চেয়ে গণপতির ম্যাজিক দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন দর্শকরা। এই ব্যাপারটা সুশীলার মনে বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে পারে। তবে দ্বিতীয় কারণটা আরও শক্তিশালী -- তা হল প্রেম।

সুশীলা সম্ভবত গণপতির প্রেমে পড়েছিলেন। খেলার দক্ষতায় বা জনপ্রিয়তায় পিছিয়ে পড়া হয়ত তিনি মেনে নিতেন কিন্তু হিঙ্গনবালার সঙ্গে গণপতির ঘনিষ্ঠতা তাঁকে ঈর্ষাতুর করে তোলে। হিঙ্গনবালা বেশি সুন্দরী হতে পারে কিন্তু সাহসে, জনপ্রিয়তায় গণপতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার যে ক্ষমতা সুশীলার ছিল, হিঙ্গনবালার তা ছিল না। তাই ওঁদের মেলামেশাটাকে সুশীলা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। এই আক্রোশ থেকেই হয়ত প্রিয়নাথবাবুর কাছে গণপতির নামে নালিশ করেন। কিন্তু এর ফল যে হিতে বিপরীত হবে, তা তাঁর ভাবনায় ছিল না। গণপতি তো সার্কাস ছাড়লেনই সঙ্গে গেলেন হিঙ্গনবালাও। এর ফলে সুশীলার নারীসত্তা, বিবেক — আঘাত জর্জর হয়ে পড়ে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিদায়ে উল্লসিত হওয়ার বদলে নিরুৎসাহই হয়ে পড়েন। এই কারণেই প্রায়ই খেলা দেখাতে দেখাতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন। সুশীলার ছোট বোন কুমুদিনীও সার্কাসের শিল্পী ছিলেন। ট্রাপিজের খেলার জন্য তাঁকে 'উড়ন্ত পরী' বলা হত। সেই কুমুদিনীও দিদিকে বহুবার সতর্ক করে দিয়েছেন। সাবধান করেছেন গুরু বাদলচাঁদও। কিন্তু তবু সুশীলা তাঁর আগের মনঃসংযোগ আনতে পারেননি। যার খেসারত তাঁকে দিতে হল ভালরকমই। সুশীলার মনের কথা কাউকে তিনি বলে যাননি। তা অজানা, রহস্যময় থেকে গেছে। অন্যদিকে সুশীলার দুর্ঘটনার পর গণপতির মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাও অজানা থেকে গিয়েছে।

সার্কাস ছেড়ে নিজের দল নিয়ে নানা জায়গায় তাঁবু ফেলে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করেন গণপতি। যেখানেই যান জয় জয়কার। তাঁবুতে তিল ধারণের জায়গা হয় না! জাদুর তাক লাগানো খেলা তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল তাঁর দুর্দান্ত অভিনয়, রহস্য সৃষ্টির ক্ষমতা, হাস্যরসের দেদার জোগান। এখনকার পরিভাষায় এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় দুর্দান্ত 'শো-ম্যানশিপ'। গণপতির দ্বেবদ্বিজে ভক্তি ছিল খুব। তাঁর আচার-আচরণ এবং জাদু দেখে লোকে তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলেই মনে করত। এই বিশ্বাস থেকেই কেউ তাঁর কাছে আসত হাত দেখাতে। কেউ গ্রহ-শান্তি করাতে বা শারীরিক, মানসিক বা ভুতুড়ে ব্যাধির দাওয়াই নিতে। গণপতি তাঁদের ফেরাতেন না। শেকড়বাকড়, টোটকা ওষুধ, মাদুলি ইত্যাদি দিতেন। অনেকে সে সব থেকে নাকি আশ্চর্য উপকারও পেতেন!

প্রসঙ্গত জাদুকর রয় হর্ণের ঘটনাটা জানানো যাক। বন্ধু সিসফ্রিডকে নিয়ে রয় ম্যাজিকের সঙ্গে বাঘ-সিংহের খেলাও দেখাতেন। ৩ অক্টোবর ২০০৩ লাস ভেগাসে একটি শোয়ে প্রশিক্ষিত বাঘই আক্রমণ করে রয়কে। মারাত্মক জখম রয় এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন। তাঁদের খেলা দেখানো সেই দিন থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

গণপতি অলৌকিক ক্ষমতাধর, এই বিশ্বাসটা রোগীকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করত, রোগ সারাতে অনেকটা সাহায্যও করত। যেমন বিভিন্ন গুরু-বাবা, মাতাজিরা করে থাকেন। সেই সঙ্গে কিছুটা কাজ করত দ্রব্যগুণও। ভবঘুরে অবস্থায় গণপতি অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করেছেন। তাঁদের কাছ থেকেই শিখেছিলেন গাছগাছড়ার ব্যবহার। বিশ্বাস এবং সেই গাছ গাছড়া একসঙ্গে দেখাত আরেক ম্যাজিক। রঙ্গমঞ্চের বাইরে গণপতি হয়ে উঠতেন আরেক জাদুকর!

ক্লেশ-নিবারক গণপতিকে ছেড়ে আবার আমরা মঞ্চের দিকে চোখ ফেরাই। যেখানে সাদা জামার ওপরে কালো কোট আর প্যান্ট, গলায় টাই পরা গণপতি দেখিয়ে চলেছেন আশ্চর্য জাদুর খেলা। কখনও তাঁর কোটের বুকে ঝুলে-থাকা অজস্র মেডেল

চমক-উল্লাসে নেচে উঠছে। দর্শকেরা হতভম্ব, বিভ্রান্ত, উচ্ছ্বসিত। কেমন ছিল সেই জাদু, কেমন ছিল তাঁর রসসৃষ্টির ক্ষমতা; অভিনয় — তার সাক্ষ্যের জন্য শরণ নিতে হবে বিশিষ্ট আলোকচিত্রী, সাহিত্যিক, শনিবারের চিঠি-সহ বহু পত্রিকার সম্পাদক পরিমল গোস্বামীর। পরিমলবাবু তাঁর 'স্মৃতিচিত্রণ' গ্রন্থে লিখছেন —

'যতদূর মনে পড়ে, টাউন হলের অঙ্গনে একদিন গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিক দেখানোর আয়োজন করা হয়। উচ্চাঙ্গের ম্যাজিক সম্পর্কে তৎপূর্বে কোনো ধারণা ছিল না। বেদেনীদের ভোজবাজি দেখেছি শুধু। ম্যাজিকে আমার ভীষণ আকর্ষণ, অতএব গণপতির ম্যাজিকে টিকিট কিনে ঢুকে পড়লাম। ইলিউশন বক্সের খেলা বেশ ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম। অলৌকিকত্বে কোনো বিশ্বাস ছিল না, অথচ নিজের বুদ্ধিতে কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা নেই, এ বড়ই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। জাদুকরের রসসৃষ্টির ক্ষমতায় পুলকিত হয়েছিলাম। পর পর তিন দিন দেখলাম, তবু রহস্য রহস্যই থেকে গেল। শুধু এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করলাম যে কৌশল একটা আছেই, শুধু আমার তা জানা নেই। যারা আত্মিক ব্যাপার ব'লে বোঝাতে এসেছিল তাদের সঙ্গে কিছু বিরোধ হয়েছিল মনে আছে।

একটি খেলা খুব উপভোগ্য মনে হয়েছিল, জাদুকর ছোট টেবিলে ছোট্ট একটি কাঠের বাক্স রেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে খুব খানিকটা বক্তৃতা দিয়ে নিলেন। বললেন, "এর মধ্যে মারাত্মক এক সাপ আছে, এ খেলাটি তাই খুব বিপজ্জনক। দর্শকদের মধ্যে সাহসী যদি থাকেন তবে উঠে আসুন।"

একজন সাহসী উঠে গেলেন। একখানা লাঠি তাঁর হাতে দিয়ে জাদুকর বলতে লাগলেন, "আমি ওয়ান, টু, থ্রী, বলবার সঙ্গে সঙ্গে এই বাক্স খুলব, দেখবেন একটি প্রকাণ্ড সাপ মাথা তুলে আছে, আপনি বিদ্যুৎ গতিতে তার মাথায় এই লাঠির বাড়ি মারবেন। — একটু দেরি করলে সাপের হাতে মারা পড়তে পারেন — অতএব খুব সাবধান। মনে রাখবেন, সাপকে দেখামাত্র মারতে হবে।" — বলে জাদুকর সেই সাহসী লোকটির গায়ের চাদর তাঁর কোমরে জড়িয়ে বেঁধে তাঁকে লাঠি উঁচু ক'রে ধ'রে কেমন ক'রে দাঁড়াতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। লোকটি হাজার লোকের সামনে দু পা ফাঁক ক'রে লাঠি উঁচু ক'রে সেই বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে! সে এক অপরূপ দৃশ্য। সমস্ত দর্শক নীরবে, কি পরিণাম ঘটে দেখার জন্য দম বন্ধ ক'রে ব'সে আছে। জাদুকর আবার সাহসী লোকটিকে বললেন, "মনে রাখবেন, ভয় পেলে চলবে না," — বলে তিনি আবার লোকটির উদ্যত ভঙ্গির দাঁড়ানোকে যথাযথ সংশোধন করে দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বললেন — "কাঁপবেন না — এইবার প্রস্তুত থাকুন — ওয়ান!"

ব'লে জাদুকর নিজেই কিছু কাঁপতে লাগলেন, এবং ভীত স্বরে বলতে লাগলেন, "কাঁপবেন না, ভয় নেই — টু!" সাহসী লোকটি ততক্ষণে সত্যিই কাঁপতে আরম্ভ করেছেন। জাদুকরও কাঁপছেন। তিনিই যেন বেশি ভয় পেয়েছেন। এবার তিনি একটু দূরে স'রে ভীষণ কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলেন — এইবার আমি থ্রী বলব, ভয় পাবেন না, কাঁপবেন না।"

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সাহসী লোকটির মাথার উপরে তোলা লাঠিসহ উদ্যত হাত দুখানি ভীষণ কাঁপতে আরম্ভ করছে। এইবার দম বন্ধকরা প্রতীক্ষার তীব্রতা চরমে তুলে জাদুকর ভীষণ চিৎকার ক'রে ভীষণ কেঁপে এবং পালিয়ে যাবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, বাক্সের ডালা এক ধাক্কায় খুলে "থ্রী" ব'লেই তিন লাফে স'রে গেলেন ওখান থেকে, লোকটি লাঠি মারতে মারতে হঠাৎ থেমে গেলেন। বাক্সের মধ্যে সাপ নেই, মারবেন কার মাথায়?

"অ্যাঁ, সাপ নেই? তা হলে আপনি ভয় পাওয়াতেই সব গোলমাল হয়ে গেছে" — ব'লে জাদুকর এগিয়ে এসে লাঠিখানা ফিরিয়ে নিয়ে সাহসী লোকটিকে বললেন, "আপনার আসনে ফিরে যান।"

এই ব্যাপারটা আগাগোড়া ধাপ্পা। সাপের ব্যাপারটা একটা ইন্টারলিউড, বিশুদ্ধ আমোদ সৃষ্টিই ছিল তার উদ্দেশ্য। আসলে ঐ ছোট্ট বাক্স থেকে শেষে এত ফুল বেরোতে লাগল যে তিনখানা টেবিলে তার জায়গা হয় না।'

পরিমলবাবুর লেখায় দু-তিনটি জায়গায় বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। একদিন খেলা দেখে তাঁকে পরপর আরও দুদিন ছুটতে হয়েছিল জাদু এবং জাদুকরের টানে। দ্বিতীয়ত, হাজার দর্শকের উপস্থিতি। আর তৃতীয় কথা, যেখানে খেলা দেখাচ্ছিলেন সেটা সার্কাসের মঞ্চ ছিল না, ছিল টাউন হল। তাই — 'গণপতি চক্রবর্তী, রয় দ্য মিস্টিক থেকে শুরু করে রাজা বোস, প্রফেসর যতীন সাহা, মান্না দি গ্রেট প্রমুখ জাদু-ব্যক্তিত্ব। স্ব-মহিমায় তাঁরা নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত প্রতিভাবান কৃতী সন্তান। কিন্তু ইতিহাসে স্থান করে নিয়ে শিল্প, সাহিত্য এবং সংবাদের শিরোনামে উঠে ম্যাজিককে হাতিয়ার করে রূপকথাময় জীবন বানাতে কেউই লোককথা, লোকগাথা এবং কল্পলোকের নায়ক হওয়ার মাত্রায় গিয়ে পৌঁছতে পারেননি। বরঞ্চ 'ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাক' হিসেবে উঁচু মহলে একটা মৃদু চাপা বিদ্রূপের উপাদান হয়েছিলেন।' — এই জাতীয় মন্তব্যকে আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। এমনকি বিশ্বনন্দিত জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র) বললেও না। গণপতি চক্রবর্তী ছিলেন মানুরে কল্পলোকের নায়ক, তাঁর জীবন ছিল রূপকথাময়। জাদুসূর্য দেবকুমারের কাছে গণপতির জীবন কাহিনী শুনে বিস্মিত অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, 'কী শুনলাম মশাই! এ রকম মানুষের জীবন নিয়ে তো সিনেমা হতে পারে!' সিনেমা দূরস্থান, তাঁর একখানি জীবনীও লেখা হয়নি। যথাযথ স্বীকৃতিও পান নি। আত্মবিস্মৃত বাঙালি তাঁকে ভুলেই গিয়েছে!

(ক্রমশ

আইলা ও প্রশ্নের ঝড়!

অঞ্জন কুমার সেনশর্মা

বিগত গ্রীষ্মের আইলা আমাদের চমকে দিয়ে কিছু প্রশ্ন রেখে গেছে। সামুদ্রিক ঝড়; যাকে এখানে সাইক্লোন বলা হয় তো কখনও পশ্চিমবাংলার ওপর দিয়ে যায় না! হয় ওড়িশা বা আরও দক্ষিণে নয়ত ঘুরে বাংলাদেশে। তবে কি এর কারণ 'বিশ্ব উষ্ণায়ন'?

এটা অবশ্যই পশ্চিম বাংলার পরম সৌভাগ্য পুবের প্রতিবেশীর তুলনায় এর ওপর দিয়ে ঝড় কমই যায়, সংখ্যায় অর্ধেকের মতো। তাই এ সিদ্ধান্তে আসা ভুল যে পশ্চিমবাংলায় ঝড় আসাটা ব্যতিক্রম। গত ২৫ বছরে 'আইলা' ছাড়া আরও ৫টি সাইক্লোন পশ্চিমবাংলার ওপর দিয়ে গেছে (১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯৮, ২০০০ ও ২০০২ সালে)। যদিও ক্ষয়ক্ষতিতে এগুলো কোনোটাই বাংলাদেশের তুল্য নয়। পশ্চিমবাংলায় শেষ বিধ্বংসী সাইক্লোন হয়েছিল ১৯৪২ সালে। সরকারি হিসেবেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে মৃতের সংখ্যা ছিল ১৫,০০০ মানুষের এবং এর বহুগুণ গবাদি পশুর। এ হিসেবটা এমন এক সময়ের, যখন তদানীন্তন সরকার চাইছিল বিপর্যয়ের যথার্থ পরিমাপ গোপন থাক (দিলীপ গুপ্তের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। খোদ কলকাতা দু-দুবার প্রচণ্ড ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়েছিল। একবার ১৭৩৭ সালে, পরে আবার ১৮৮৪ সালে। ঝড় হিসেবে 'আইলা' এদের কাছে শিশু। এর প্রসঙ্গে বেচারি 'উষ্ণায়ন'কে খামোখাই টেনে আনা।

এইসব দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ যা পারছে আমরা তা পারছি না কেন?

এটা ঠিকই এ ব্যাপারে বাংলাদেশ অনেক বেশি সচেতন এবং সক্রিয়। তবে তার প্রধান কারণ, দুর্ভাগ্যবশত গত বেশ কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশকে ঘনঘন এই বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের সৌভাগ্যই আমাদের আপেক্ষিক অপ্রস্তুত অবস্থার জন্য দায়ী! তার ওপর সাধ্য যেখানে সীমিত সেখানে কোন্ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন সে বিবেচনাও করতে হয়। তবে এ ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন, যে বাংলাদেশ বাঁধ দিয়ে এ জাতীয় দুর্যোগ ঠেকাতে পেরেছে। 'আইলা'য় বাংলাদেশের ১৪০০ কি মি বাঁধ ভেসে গেছে, মারা গেছে ১৯০ জন ও গৃহহারা ৪৮ লক্ষ। সমস্যা আমাদের দু দেশের একই — যে অঞ্চলের ওপর সমুদ্রের ঝড় প্রথম আছড়ে পরে সেটা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ অঞ্চল। নদীনালা, খাঁড়ি, খালে ঘেরা ছোট ছোট সমতল দ্বীপ, চর বলাই ভালো, অধিকাংশ এতই নীচু যে জোয়ারে ডুবে যায়, ভাঁটায় ভেসে ওঠে। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়গুলোকে চারপাশে মাটির বাঁধ দিয়ে চাষযোগ্য করে মানুষ বসানো হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। তৎকালীন সরকারের সেই অমানবিক সিদ্ধান্তের ফলভোগ করছেন বর্তমান বাসিন্দারা। এ বাঁধগুলো শুধু স্বাভাবিক জোয়ারের জল আটকাবার মতোই উঁচু। বর্ষায় ফেঁপে ওঠা নদীর জল বা খারাপ আবহাওয়ায় উত্তাল সমুদ্রের নোনা জল বাঁধ ছাপিয়ে ভেতরে চলে আসে। সাইক্লোনের বিপুল জলোচ্ছ্বাস বাঁধগুলোকে খড়ের কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এখানকার নতুন গজিয়ে ওঠা পলি জমা মাটিতে কোনো রকম শক্ত কাঠামোই বানানো যায় না, জলোচ্ছ্বাসের প্রবল চাপ সহ্য করার মতো পাকা বাঁধ তো দূরের কথা। তাই বাঁধ দিয়ে জলোচ্ছ্বাস ঠেকানো আমাদের বদ্বীপ অঞ্চলে সম্ভব নয়। বলে রাখা ভালো পুরোপুরি ঠেকানোর চেষ্টা আমেরিকার মতো ধনী দেশও করেনি অসম্ভব জেনে। আমাদের মতো তাদেরও মূলত নির্ভর করতে হয় উপকূলে ঝড়ের সম্ভাব্য লক্ষ্যস্থল থেকে লোক সরিয়ে নেবার ওপর। এ ব্যাপারে দক্ষিণ বাংলার নদীনালা এক বিশাল অন্তরায়। সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা আবহাওয়ার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। ঝড়ে উত্তাল জলপথে লক্ষাধিক লোককে উপকূল থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনা, তাও দু-একবেলার মধ্যে, একেবারেই অসম্ভব। অত্যন্ত দুঃখের হলেও এ কথা মেনে নিতেই হবে যে সাইক্লোন আক্রান্তদের চরম কষ্ট অবশ্যম্ভাবী। প্রশ্ন শুধু কতটা এবং কতক্ষণের জন্য। সব 'বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ' কর্মসূচির প্রাথমিক লক্ষ্যই হচ্ছে এই দুটোকে যথাসম্ভব কমিয়ে আনা। সমস্যা যেখানে দুরূহ এবং সামর্থ্য যেখানে তুলনায় অকিঞ্চিৎকর — শুধু আর্থিক নয়, প্রায়োগিকও, সেখানে এ সময়টা কখনও কখনও অন্যায় রকমের বেশি মনে হয়। আরও মনে হয় এ কারণে যে, বিজ্ঞান / প্রযুক্তি আর সরকারি তৎপরতার ওপর আমাদের প্রত্যাশা এবং নির্ভরতাও অযৌক্তিক ভাবে বেড়ে গেছে।

শক্তির নিরিখে আইলা ছিল দুর্বলতম সাইক্লোনের একটি। শক্তিশালী সাইক্লোনগুলো আসলে তিন তিনটি দুর্যোগ একত্রে যাদের প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা বিপর্যয় ঘটাতে পারে। প্রথম তো অবশ্যই প্রচণ্ড ঝড়। দ্বিতীয়, তুমুল বৃষ্টি — মুষলধারে এবং অবিশ্রান্ত, বন্যা তৈরি করার মতো, এবং সবশেষে, সবথেকে ভয়ঙ্কর— ডাঙায় ধেয়ে-আসা সমুদ্রের জল। নদীর 'বানে'র মতো 'জলোচ্ছ্বাস', তবে বহুগুণ উঁচু আর বিস্তৃত। এ তিনটির মিলিত তাণ্ডব 'সাইক্লোন' — প্রকৃতির সবথেকে ভয়াল রূপ।

আমরা তার একটি দুর্বল নমুনা দেখেছি মাত্র। প্রতিবছর সারা পৃথিবীতে দুর্যোগে যত লোকক্ষয় ও আর্থিক ক্ষতি হয়, তার সবথেকে বড় অংশ হয় সাইক্লোন থেকে। এবং এই ক্ষতির সিংহভাগ ঘটায় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। তুলনায় ঝড় বা বৃষ্টির ক্ষতি করার ক্ষমতা নগণ্য। সৌভাগ্য এই সব সাইক্লোন জলোচ্ছ্বাস তৈরি করতে পারে না। তার জন্য ঝড়কে যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হয়, সঙ্গে চাই উপকূলের অগভীর সমুদ্র। দক্ষিণ বাংলার উপকূলের সমুদ্র দুর্ভাগ্যক্রমে খুবই অগভীর। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের টেনে আনা পলি জমে জমে উত্তর বঙ্গোপসাগরে মহীসোপান (কন্টিনেন্টাল শেলফ) বহুদূর বিস্তৃত হয়ে গেছে। ছোটোখাটো সাইক্লোনও তাই দক্ষিণবঙ্গে জলোচ্ছ্বাস বয়ে নিয়ে আসে। (আইলায় জলোচ্ছ্বাসপশ্চিমবাংলায় তেমন কিছু না হয়ে থাকলেও বাংলাদেশে ১০ ফুট। অথচ তীব্রতার বিচারে আইলা কখনই সাইক্লোনের যোগ্য প্রতিনিধি নয়। তীব্রতার মাপে ঝড়গুলোকে যদি ওপর থেকে নীচে সাজানো যায়, আইলার জায়গা হবে কোনোরকমে একদম তলায়)।

সাইক্লোনের জলোচ্ছ্বাসের প্রকৃতি কিন্তু সমুদ্রের ঢেউয়ের থেকে আলাদা। সমুদ্রের ঢেউগুলোকে যদি চলমান দেওয়ালের সঙ্গে তুলনা করি তবে জলোচ্ছ্বাসের তুলনা হবে অতটাই উঁচু একটা সচল ঢিবির সঙ্গে। ঢেউ, তা সে যত উঁচুই হোক, ডাঙায় ওঠা মাত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। জলোচ্ছ্বাস, তার বিশাল বপু নিয়ে ঢুকে যায় তটরেখার অনেক ভেতর পর্যন্ত। আমাদের দু'বাংলার উপকূলে জলোচ্ছ্বাস ১২ কি মি (অর্থাৎ ৪০ ফুট, আধুনিক চারতলা বাড়ির সমান উঁচু) পর্যন্ত হয়েছে। এই ঢিবি চলে ঝড়ের কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে, তাই ঝড় যে গতিতে এগিয়ে আসে এরও গতিবেগ তাই থাকে। (এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন পৃথিবী বা লাট্টুর মতো সাইক্লোনেরও দুটি গতি। একটা তার নিজেরই চারদিকে, যা দিয়ে ঝড়ের তীব্রতা মাপা হয়। অন্যটা অনেক ধীর, যে গতিতে পুরো ঝড়টা এগিয়ে চলে। এ দুটো গতিবেগের অনুপাত ১০:১)। এ দুটো গতিবেগের অনুপাত মোটামুটি যদি মনে রাখি এক ঘনমিটার জলের ওজন এক মেট্রিক টন অর্থাৎ ১০০০ কিলোগ্রাম তবেই এরকম একটা চলমান জলের পাহাড়ের ধাক্কা কতটা বিধ্বংসী হতে পারে সেটা অনুমান করা সহজ হয়। এর সামনে কুঁড়েঘর তো দূরের কথা, খুব শক্তপোক্ত পাকা ইমারত ছাড়া আর কিছু দাঁড়াতেই পারে না। এই ঢিবির ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো থাকে সমুদ্রের ঢেউ আর থাকে উপড়ে যাওয়া গাছ, নোঙর ছেঁড়া নৌকো, লঞ্চ, ছোট স্টিমার ইত্যাদি। জলের ধাক্কা খেয়েও যে সব ঘরবাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, সেগুলোকে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেবার জন্য। বাংলাদেশে যে ক'টি ঝড়ে লক্ষাধিক প্রাণ গেছে সেগুলোর সবকটাতেই ৯ থেকে ১২ মিটার (অর্থাৎ ৩০ থেকে ৪০ ফুট) জলোচ্ছ্বাস ছিল।

সুন্দরবন আছে বলেই কি কলকাতা বেঁচে যাচ্ছে?

দক্ষিণবাংলা দিয়ে আসা ঝড়গুলোর ওপর সুন্দরবনের অরণ্যের প্রভাব তো রয়েইছে। সমুদ্রের সাইক্লোন ডাঙায় উঠলে দুটো কারণে তার শক্তি দ্রুত ক্ষয় হতে থাকে। প্রথমত সে তার শক্তির উৎস সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, স্থলভূমির সঙ্গে ঘর্ষণে তার প্রচুর শক্তিক্ষয় হতে থাকে। জঙ্গলের গাছপালার ওপর দিয়ে আসতে এই ক্ষয় তাড়াতাড়ি হয়। এর সুফলটা অবশ্য বেশি পান সুন্দরবনের কাছাকাছি অঞ্চলের মানুষজন। সমুদ্র আর সুন্দরবন থেকে প্রায় ১৩০ কি মি উত্তরে কলকাতা এর সুফল খুব কমই পায়।

সুন্দরবনের অরেকটি সুফল আসে বাদা (ম্যানগ্রোভ) বন থেকে। পলি জমে আস্তে আস্তে জেগে ওঠা মাটিকে আঁটো করা এবং ফিরতি ঢেউয়ের টানে একে ক্ষয়ে যেতে না দেওয়া, এ সবে বাদাবনের গুরুত্ব অনেক। তবে কলকাতাকে সাইক্লোনের জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচানোতে এদের কোনো ভূমিকাই নেই। কারণ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস উপকূল পেরিয়ে এত দূর আসতে পারে না। কলকাতা যখন সাইক্লোনে ভাসে (অতীতে দু'বার ১৭৩৭ ও ১৮৬৪ সালে ভেসেছিল) তখন সমুদ্রের জল সুন্দরবন পেরিয়ে আসে নি। এসেছিল হুগলি নদী ধরে। তটরেখায় কোনো ছেদ না থাকলে জলোচ্ছ্বাস উপকূল পেরিয়ে সব থেকে বেশি দূর এ পর্যন্ত এগিয়েছে ২৫ কি মি। কিন্তু যখন কোনো জলোচ্ছ্বাস নদী বা কোনো জলপথের মোহানা সামনে পায় তখন সেটা বেয়ে অনেকদূর পর্যন্ত ভেতরে ঢুকে আসতে পারে। বাংলাদেশে ১৯৭০-এর ঝড়ে জলোচ্ছ্বাস নদীপথ বেয়ে ১৬০ কি মি পর্যন্ত ভেতরে ঢুকেছিল। কলকাতা যদি আবার কোনো দিন ভাসে তবে সে প্লাবন আসবে, এবং আসতেই পারে ভবিষ্যতে, হুগলী নদীর পথ ধরে। আইলার তীব্রতা বা গতিপথ কোনোটাই তার অনুকূল ছিল না।

সাইক্লোনের মত ঝড়গুলোকে আটকানো বা নিদেনপক্ষে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না?

অনেকের কাছে উত্তরটা স্পষ্ট— যাচ্ছে না, কারণ আমাদেরই খামতি। শুধুমাত্র প্রযুক্তি বা আর্থিক সামর্থ্যে নয়, দক্ষতা আর নিষ্ঠাতেও। অস্বীকার করা যায় না এই দুর্বলতাগুলো বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। কিন্তু এটাও জানা দরকার যে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি পৃথিবীর কোথাও এমন স্তরে এখনও পৌঁছয় নি যাতে মানুষ এ জাতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সমস্যাটা সব দিক থেকে বোঝবার জন্য আসুন আমরা এ ব্যাপারে পৃথিবীর সব থেকে ধনী ও বিজ্ঞানে উন্নত দেশের অভিজ্ঞতাটা একটু দেখে নিই। সাইক্লোন তাঁদেরও একটি সমস্যা। যদিও ওঁরা তাকে 'হারিকেন' বলেন। আমেরিকায় গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে উদ্বিগ্ন নাগরিকেরা সে দেশের আবহাওয়া দপ্তরকে পরামর্শ দিতেন জাহাজ থেকে কামান দেগে ঝড়গুলোকে

ধ্বংস করে দিতে। মুশকিল হচ্ছে এই ঝড়গুলো (যেমন আইলা) বায়ুমণ্ডলে গাঁথা, অনেক উঁচু স্তরের বায়ুস্রোতের সঙ্গে ভেসে চলা, বিশাল ঘূর্ণি।

ভূপৃষ্ঠের ওপর প্রায় খাড়া দাঁড়ানো এই ঘূর্ণিগুলোর গড় ব্যাস ৫০০ কিলোমিটারের মত। অর্থাৎ গড়ে প্রায় ২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে এদের বিস্তার, যা কিনা উড়িষ্যা রাজ্যের থেকেও বেশি। উচ্চতাতেও এ প্রায়ই ১৫ কিলোমিটার ছাড়িয়ে যায় অর্থাৎ এভারেস্ট শৃঙ্গের প্রায় দু'গুণ। এর প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের ৩০ লক্ষ ঘন কিলোমিটার অর্থাৎ ওজনে ২০ কোটি মেট্রিক টন বাতাস চালিত হয়। কামান দেগে একে শায়েস্তা করার চিন্তাও বাতুলতা।

পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার হবার পর অনেকে ভাবলেন এবার একটা মোক্ষম দাওয়াই পাওয়া গেল। কিন্তু না। একটি পারমাণবিক বোমায় যে পরিমাণ শক্তি থাকে সাইক্লোনে শক্তি থাকে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। সেটা প্রতি মিনিটে একটি করে মেগাটন মাত্রার হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের সমান। তাও যদি কোনোভাবে এরকম কোনো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ঝড়টিকে তখনকার মত নিষ্ক্রিয় বা শান্ত করাও যেত তাহলে ও প্রকৃতির যে প্রক্রিয়ায় ঝড়ের উদ্ভব থাকে থামানো যেত না। ১৫ মিনিটেই ঝড়কে আবার তার আগের তীব্রতায় পৌঁছে দিত।

প্রশ্ন ওঠে, এগুলোকে তাহলে তো অঙ্কুরে বিনাশ করলেই হয়। এ ঝড়গুলোর জন্ম হয় বিষুব রেখার দুপাশের গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্রের ওপরে, সাধারণত স্থলভাগ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। প্রথমে কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে অনেকগুলো সাইক্লোনের বীজের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে বেঁচে থাকার, বেড়ে ওঠার, যেমন হয় শস্যের বীজতলায়। শেষ পর্যন্ত এদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠে চারপাশের বায়ুমণ্ডলের প্রশ্রয়ে একটি পরিপূর্ণ সাইক্লোন হয়ে যায়। এই বিশাল বিশৃঙ্খল অঞ্চল থেকে বিকাশোন্মুখ বিপজ্জনক সাইক্লোনটিকে (ধ্বংস করার জন্য) খুঁজে নেওয়া অসম্ভব।

এছাড়াও আছে খরচের প্রশ্ন। আর সে কারণেই বিপুল ব্যয়সাধ্য এই বোমাবর্ষণ শুধু সেই সাইক্লোনটির জন্যই রাখতে হতো যেটি তীরের দিকেই আসছে। মুশকিল হচ্ছে সেই সব সাইক্লোনই তীরের দিকে আসে যেগুলো তীরমুখী বায়ুস্রোতে ভাসছে। তাই এ অবস্থায় যদি কোনোক্রমে সাইক্লোনটিকে ঠেকানোও যায় বোমা থেকে তৈরি তেজস্ক্রিয় দূষণ আটকানো যাবে না, তীরে এসে পড়বে। ফল হবে সাইক্লোনের থেকেও মারাত্মক। সব থেকে বড় বিপদ হচ্ছে যে পুরো ব্যাপারটাই উল্টো ফল দিতে পারে। এমনও হতে পারে পারমাণবিক বিস্ফোরণের শক্তি সেই বেড়ে ওঠা ঝড়কে আরো দ্রুত, আরও তেজীয়ান করে তুলল। সবদিক বিবেচনা করেই শেষ পর্যন্ত সাইক্লোনকে জবরদস্তি দমানোর চেষ্টা অবাস্তব বলেই পরিত্যক্ত হয়েছে।

গত শতকের চল্লিশের দশকের শেষ দিক থেকে গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছিল যে মেঘের মধ্যে কোনো কোনো রাসায়নিক দ্রব্যের সূক্ষ্ম কণা ছড়িয়ে দিতে পারলে এর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রাথমিক উল্লাসে মনে করা হয়েছিল ইচ্ছেমত আবহাওয়ার দিন এল বলে, ফলাও করে এই প্রকৌশলকে 'আবহাওয়া সংশোধন' (ওয়েদার মাডিফিকেশন) নাম দেওয়া হয়েছিল। সাইক্লোনের ওপর এর প্রয়োগ প্রথম থেকেই করা হচ্ছিল। (এখানে বলে রাখা ভাল এই প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার এখন অনেক দেশেই হচ্ছে। যেমন ভারতের খরাপ্রবণ রাজ্যগুলোতে কৃত্রিম বৃষ্টি ঘটানোয়, আফ্রিকায় শস্যের ক্ষতিকারক শিলাবৃষ্টি ঠেকানোতে এবং অতি সম্প্রতি চীনে অলিম্পিকে উদ্বোধনের দিনে আর ওদেরই যাট বছর পূর্তির কুচকাওয়াজে বৃষ্টি ঠেকাতে ইত্যাদি)।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহিত হয়ে মার্কিন সরকার ১৯৬২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি কার্যক্রম চালু করে, অতি সঙ্গত ভাবে এর নামকরণ হয় 'ঝঞ্ঝারোধ প্রকল্প' (প্রজেক্ট স্টর্ম ফিউরি)। উদ্দেশ্য ঝড়ের তীব্রতা প্রশমিত করা।

যুক্তিটি খুব সরল। প্রতিটি গতিশীল ব্যবস্থায় এক বা একাধিক 'নিয়ন্ত্রণ বিন্দু' থাকে যেখানে সামান্য হস্তক্ষেপেই ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহে প্রভাব ফেলতে পারে। প্রবল সাইক্লোনের ক্ষেত্রে এরকম একটি অঞ্চল আছে, যাকে বলা হয় 'অক্ষি প্রাকার' (আই ওয়াল) অঞ্চল।

সাইক্লোন এক বিশেষ ধরনের ঝড় যেখানে নীচের স্তরের বাতাস একটা প্রায় বৃত্তাকারে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের দিকে সাপের কুণ্ডলীর মত পেঁচিয়ে আসে। বায়ুস্রোত যত কেন্দ্রের দিকে এগোয় ততই তার গতিবেগ বাড়তে থাকে। কেন্দ্রের ২০ কি. মিটারের মত দূরত্বে এসে বাতাসের অন্তর্মুখী গতি বন্ধ হয়ে যায়, জড়ো হওয়া বাতাস ওপরে উঠতে থাকে। এর ফলে বিশাল আকার সব বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে কেন্দ্রের চারদিকে বৃত্তাকারে জমাট বাঁধে। এগুলো মিলে প্রায় চল্লিশ কি. মি. ব্যাস আর প্রায় ২০ কি. মি. উঁচু দৈত্যের মত একটা যেন চিমনি তৈরি হয়। এই অঞ্চলটিরই নাম দেওয়া হয়েছে 'অক্ষি প্রাকার' অঞ্চল। বাতাসের গতি এখানে সবচেয়ে তীব্র। বৃষ্টিপাত সব থেকে বেশি। তবে এই 'প্রাকার' যে অঞ্চলটি ঘিরে থাকে, অর্থাৎ এর ভেতরে বাতাস অনেক শান্ত, মেঘ প্রায় থাকেই না। ওপর (বিমান বা কৃত্রিম উপগ্রহ) থেকে দেখলে প্রায়শই এ অঞ্চলটিকে নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা যায়। ঝড়ের কেন্দ্রের ঘন মেঘের আচ্ছাদনের ভেতর একটা স্বচ্ছ ছিদ্র যার দিকে বিশালাকার জলভরা মেঘের সারি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে।

যে কোনো ঝড়ের ক্ষেত্রে এই 'অক্ষি' ছোট হয়ে আসা মানে বাতাসের গতিবেগ বাড়ছে, বিপরীতে এটা বিস্ফারিত হয়ে আসা মানে গতিবেগ কমছে। এই অঞ্চলে শুধু যে ঝড় সবচেয়ে প্রচণ্ড তাই নয়, এটি বলা যায় ঝড়ের মর্মস্থানও বটে। যে প্রক্রিয়া সমুদ্র

থেকে শক্তি আহরণ করে এই নারকীয় যন্ত্রটিকে চালায় তার প্রায় সমস্তটাই এই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। তার ওপর অঞ্চলটি সুনির্দিষ্ট, সহজেই চিহ্নিত করা যায় এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্যভাবে ছোট। 'ঝঞ্ঝারোধ প্রকল্প' এই অনুমান নিয়ে এগোল যে এই অঞ্চলে কোনো পরিবর্তন আনতে পারলে তা ঝড়ের তীব্রতাতেও প্রভাব ফেলবে। তাই ঝড়ের তীব্রতা বাড়া রোধ করতে এবং তীব্রতা কমাতে 'প্রকল্প' এই 'অক্ষি প্রাকারে'র মেঘগুলোকে প্রভাবিত করার কথা চিন্তা করলেন।

শক্তিশালী সাইক্লোনগুলোর বিধ্বংসী দিকগুলোর সবকটি — ঝোড়ো হাওয়া, তুমুল বর্ষণ এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস — প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত তার 'অক্ষিপ্রাকার' অঞ্চলের তীব্রতম বায়ুবেগের সঙ্গে। এমন কি সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস — শক্তিশালী সাইক্লোনে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির জন্য যা প্রধানত দায়ী — তারও উৎপত্তি সমুদ্রপৃষ্ঠে সাইক্লোনের বায়ুস্রোত যে ঘর্ষণের সৃষ্টি করে তার ওপর। বাতাসের গতিবেগ কমার সঙ্গে সঙ্গে সাইক্লোনের বিধ্বংসী ক্ষমতাও কমে যায়। এবং যেহেতু সাইক্লোনে সম্ভাব্য ক্ষতি বায়ুবেগের তৃতীয় ঘাত (থার্ড পাওয়ার)-এর মোটামুটি আনুপাতিক, বায়ুবেগ সামান্য কমলেও এর ধ্বংস করার ক্ষমতা অনেকটাই কমে। উদাহরণ : বায়ুবেগ ২০% কমলে, ধ্বংস প্রায় অর্ধেক হয়ে যাবে।

গবেষণা কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল সাইক্লোনের যথোচিত অংশে 'বীজ' ছড়িয়ে 'অক্ষিপ্রাকার'কে বাইরের দিকে সরে যেতে অর্থাৎ বিস্ফারিত হতে উদ্বুদ্ধ করা। ঝড়ের ভেতরকার ভৌত প্রক্রিয়াগুলো তখন ঝড়ের সর্বোচ্চ বায়ুবেগ কমা নিশ্চিত করে দেবে।

প্রকল্পের শুরুটা হলো যেন স্বপ্নের মত। প্রতিটি পরীক্ষাই চমৎকারভাবে সফল। তবে দুর্ভাগ্য আসতেও সময় লাগলো না। অনেকগুলো বছরে এমন হলো যে পরীক্ষা চালানোই গেল না, হয় সে বছরের ঝড়গুলো বীজ বপন উড়োজাহাজের নাগালের বাইরে, নয়ত এত দুর্বল যে বীজ ছড়িয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না অথবা ডাঙার — এবং স্বাভাবিক কারণেই দুর্বল হবার — মুখে বলে পরিবর্তন প্রকট হবার সময়ই পায় না। আগ্রহ ক্রমে কমতে লাগলো এবং কোনো কোনো প্রধান অংশীদার যেমন নৌবাহিনী, সরে গেল। সাফল্যের আশা থিতিয়ে এল।

প্রকল্পের দ্বিতীয় দশক থেকে এর পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি থেকে ভূরি ভূরি সব তথ্য জড়ো হতে লাগলো যাতে করে প্রথম দিকের পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ব্যাখ্যাগুলো নিয়েই সন্দেহ দেখা দিল। ঝড়ের যে সব পরিবর্তনগুলোকে মনে করা হয়েছিল বীজ ছড়ানোর ফল, দেখা গেল সেগুলো আপনা থেকেই হতে পারে এবং হয়েও থাকে। এবং এ দুটো কারণ — অর্থাৎ কৃত্রিম না স্বাভাবিক — আলাদা করার কোনো উপায় নেই। বাইরের হস্তক্ষেপেই যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করার কোনো উপায় না পেয়ে প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় ১৯৮৩ সালে।

সাইক্লোনের গতিমুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টাও বন্ধ করতে হলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতার জন্য। প্রতিবেশী দেশগুলো সন্দেহ করতে শুরু করেছিল যে সাইক্লোন তাদের দেশে এসেছে গতিমুখ ঘুরিয়ে দেবার ফলে। অবশ্য এ প্রচেষ্টা সরকারিভাবে বন্ধ করা হলেও গোপনে যে চলছিল তার আভাস পাওয়া যায় ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ওখানকার সরকারের অভিযোগ থেকে।

তবে কি আমাদের মত গরিব দেশগুলোর কিছুই করার নেই? অসহায় আত্মসমর্পণ?

প্রায় সব দেশেই, এমনকি সব থেকে শক্তিধর দেশেও, যা করা হয় তা হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণের বা সম্পত্তির, যথাসম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টা। যে অঞ্চলে সাইক্লোনটি আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা সেখান থেকে লোকজন সরিয়ে নেওয়া। তবে এতে দৈনন্দিন জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায় বলে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত সাময়িক না হয়ে পারে না, খুব বেশি হলে দু' একদিনের জন্য। এ জন্য সব দেশে 'সাইক্লোন সতর্কীকরণ ব্যবস্থা' (সাইক্লোন ওয়ার্নিং সার্ভিস) রয়েছে, যাদের কাজই হচ্ছে এ সব প্রতিরোধী বন্দোবস্ত কখন এবং কোন অঞ্চলে নেওয়া প্রয়োজন সে ব্যাপারে কর্মকর্তাদের অবহিত করা। তাদের সঙ্কেতেই শুরু হয় সেই বিশাল কর্মকাণ্ড, প্রায় লক্ষাধিক লোককে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আসন্ন বিপদ থেকে সরিয়ে আনা, তাদের আশ্রয়ের, খাদ্যের বন্দোবস্ত করা।

আমাদের দু'বাংলার সমুদ্র উপকূলের ভঙ্গুর যোগাযোগ ব্যবস্থায় এ কাজ কত দুঃসাধ্য তা কল্পনা করা কঠিন বই কি। বিপর্যস্ত মানুষের ক্ষোভও তাই অকারণ বলা যায় না। তবু তাদের জানা প্রয়োজন যে মাঝে মাঝে এই দুর্ভোগ অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির রুদ্ররূপের কাছে মানুষ এখনও অসহায়।

ঋণ স্বীকার :

ড: গোকুলচন্দ্র দেবনাথ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন।
ড:সুবীর ঘোষ ও শ্রী সত্যেন সেনগুপ্ত অনেক সংশয় নিরসন করেছেন।

সহায়ক আকর :

1. www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/tcfaq/HED.html
National Oceanic and Atmospheric Administration Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory Hurricane Research Division
2. www.imd.gov.in/section/nhac/dynamic/faq/FAQP.htm India Meteorological Deptt.
Book:
Hurricanes : Their nature and Impacts on Society (1997)–R.A Pielke (Jr) & RA Pielke (Sr) - John Wiley & Sons.

সংঘর্ষ আর নির্মাণে মগ্ন একটি জীবন

গত ২৮.৯.৯১ তারিখের ভোররাতে 'ছত্তিশগড় শ্রমিক সংঘে'র নেতা শংকর গুহ নিয়োগী নিদ্রিত অবস্থায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন। গত এক-বছর ধরে ভিলাই অঞ্চলের বিভিন্ন শিল্প শ্রমিকেরা 'ন্যূনতম' মজুরি ও মর্যাদার দাবিতে 'ছত্তিশগড় শ্রমিক সংঘে'র নেতৃত্বে আন্দোলন করছেন। পুলিশ, প্রশাসন ও গুন্ডাদের বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার সত্ত্বেও আন্দোলন চলতেই থাকে। আন্দোলনের নেতা হিসেবে নিয়োগীজীর ওপরেও নিপীড়নমূলক প্রচেষ্টা চলতেই থাকে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, পরে জেলা থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। কোনোভাবেই শ্রমিক আন্দোলনকে বন্ধ না করতে পেরে শিল্প মালিক ও ঠিকাদারদের জোট তাঁকে হত্যা করল।

নিয়োগীজীকে আমরা কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পেয়েছিলাম। জীবনের প্রতি তাঁর আশা ছিল অত্যন্ত গভীর। তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিতে প্রতিফলিত হতো গরীব মেহনতী মানুষের বিচারবুদ্ধি ও ক্ষমতার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা। আর সবচেয়ে যেটা ভাল লাগত — এত বিরাট কর্মযজ্ঞের নেতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েও তিনি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ হয়েই ছিলেন — দেবতা হয়ে যান নি।

অসম্ভব আশাবাদী, অসাধারণ সাহসী, সাধারণ মানুষের একেবারে কাছের, একান্ত আপনার নিয়োগীজী ছিলেন ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা সম্পর্কিত আমাদের সমস্ত ধ্যান-ধারণার থেকে একদমই অন্যরকম। ট্রেড-ইউনিয়নের কাজকর্মের বাইরেও তাঁর চিন্তার পরিধি ছিল — সমস্ত সামাজিক সমস্যাকে ঘিরেই। রাজহরাতে যাঁরা গেছেন অথবা ওখানকার আন্দোলনের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন ওখানকার বিরাট হাসপাতাল তৈরির ইতিহাস। এছাড়াও বিভিন্ন স্বাস্থ্য-কার্যক্রম, মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন —এ সব তো আজ সারা ভারতেই ইতিহাস তৈরি করেছে। এমন কি মজদুর পরিবারগুলির ছোটোখাট সামাজিক পারিবারিক সমস্যাগুলিকেও তিনি কখনোই তুচ্ছ-জ্ঞান করতেন না। 'নেতাজী' বলে একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়েও তাঁর কাছে আসতে কেউ কখনও দ্বিধা বোধ করত না।

উৎস মানুষ-এর প্রচেষ্টাকে নিয়োগীজীর খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো। উত্তরবঙ্গে নিজের বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের লোকের কাছে উৎস মানুষ-এর কথা শুনে উনি খুবই উৎসাহিত হন এবং এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে কিছু আলোচনাও হয়। কিছুদিন আগে উৎস মানুষ-এ প্রকাশের জন্য বর্তমান [পরিবেশ-ভাবনা] পাঠান। বন সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে 'ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা'র কিছু ভাবনা-চিন্তা ও আন্দোলনের রূপরেখাই এই লেখা।

চঞ্চলা সমাজদার, আশিস কুন্ডু

পরিবেশ-ভাবনা

শংকর গুহ নিয়োগী

'ছত্তিশগড় মাইন্‌স শ্রমিক সংঘ' (সি এম এস এস) খনি শ্রমিকদের একটি সংগঠন। সি এম এস এস তার জন্ম মূহুর্ত থেকেই প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়ন কার্যপদ্ধতি থেকে পৃথক এক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করে, যার মাধ্যমে এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকবৃন্দ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ধরনের কাজেও ভাগ নিতে থাকেন।

ইউনিয়ন সদস্য ছাড়াও অন্য অসংগঠিত শ্রমিক ও গ্রামীণ আদিবাসী জনসাধারণের মধ্যে ইউনিয়ন গত বছর দশেক ধরে 'স্বাস্থ্যের জন্য সংঘর্ষ কর' আন্দোলন চালাচ্ছে। জাদু প্রদর্শন, পথ নাটিকা, লিফলেট, পুস্তিকা, পথসভা এবং অন্যান্য ছোটো কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে আন্দোলন আরো বেড়েছে। এই আন্দোলনেরই এক অঙ্গ হিসেবে শ্রমিকরা একটি হাসপাতালও তৈরি করেছেন, যার বেড সংখ্যা আজ ৫০-এর ওপর; এবং যেখানে আজ আধুনিক শল্য-চিকিৎসার ব্যবস্থা, প্রসূতি-কক্ষও রয়েছে।

সি এম এস এস ইতিহাস খোঁজার কাজও করেছে এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের বলিদান বিদস সমারোহের আয়োজন করে, ছত্তিশগড়ের জনতার নতুন চেতনা ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করেছে। শহীদ বীর নারায়ণ সিংহ-র নাম এ-পর্যায়ে উল্লেখনীয়।

শ্রমিকদের মধ্য থেকে মদের নেশা দূর করার জন্য ইউনিয়ন সফলতার সঙ্গে শরাব বন্দী আন্দোলন চালিয়েছে।

ক্রীড়া, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও ইউনিয়ন উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। ছটি স্কুল-ভবন শ্রমিকরা তৈরি করে সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। বর্তমানে একটি প্রাথমিক স্কুল ইউনিয়ন চালায়। নারীমুক্তির কাজেও ইউনিয়নের প্রয়াস লক্ষণীয়। হাজারো মহিলা ইউনিয়নের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে মহিলাদের বিশেষ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য প্রচেষ্টারতা।

পরিবেশ সমস্যার বিষয়ও বার বার ইউনিয়ন সামনে এনেছে। কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ না করে, বাস্তব কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ সমস্যার বিভিন্ন দিক-নির্দেশক কাজ করার চেষ্টা করেছে। বর্তমান নিবন্ধে আমরা আমাদের পরিবেশ-ভাবনা ও সেই সংক্রান্ত কার্যক্রমের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব।

পরিবেশ-সুরক্ষার বিষয়ে কেন ইউনিয়ন ভাবনা শুরু করল?

পর্যবেক্ষণ এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান লাভ করি। সমতা, সমস্যা ও সমধর্মিতা অথবা অসমতা, বিরূপতা ও বিপরীত-

ধর্মিতাকে পর্যবেক্ষণ করে আমরা আমাদের জ্ঞানকে দৃঢ় করি। জানা অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করা আমাদের জীবনের বুনিয়াদ।

কোনো কোনো জ্ঞান আমাদের বিচলিত করে — বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের ওজোন-স্তরের বিঘটন, হাওয়ার অক্সিজেন কমে যাওয়া, বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রাধিক্য — আমাদের ব্যাকুল করে। ট্রেড ইউনিয়নের সচেতন কর্মীরা সময় সময় এ সব বিষয়ে আলোচনা করেন।

আমাদের এলাকারই শংখিণী নদীর জল অথবা দল্লী খাদান থেকে বেরোনো প্রাকৃতিক নালা যখন লোহা আকরের গুঁড়ো (Fines)-এর সঙ্গে মিশে রক্তরাঙা হয়ে যায় অথবা ডিস্টিলারি, ইস্পাত কারখানা আর সার কারখানার বিষাক্ত তরল যখন শিবনাথ নদী বা খারুন নদীর জলকে প্রদূষিত করে তখন শিল্পোদ্যোগের বিকাশের নামে বিনাশ লীলা দেখে আমরা চিন্তিত হই। ইউনিয়নের আলোচনাসভা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

গ্যাস বুস্টার, কম্প্রেসর বা ব্লাস্ট ফার্নেসের শ্রমিক সাথী কিছুদিন কাজ করার পর যখন কোকিলের আওয়াজ শুনতে পান না, আমরা আমাদের দুর্ভাগ্য মনে করে চুপ করে থাকি।

উপরিল্লেখিত জ্ঞানগুলি সাধারণ প্রকৃতি থেকে পাওয়া, আমরা কিন্তু পরিবেশ-সুরক্ষার বিশেষ বিষয়টিকে সাধারণ প্রাকৃতিক জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে ব্যর্থ হই। খনি অঞ্চলে পরিবেশ বিনাশ এক চরম সীমায় পৌঁছেছিল।

ইউনিয়নের কর্মীরা বিশ্বাস করেন যে :

১. যেখানে অন্যায় বা অত্যাচার হয়, সেখানে প্রতিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

২. বিনাশের প্রক্রিয়াকে নির্মাণের সৃজনশীলতা দিয়ে মোকাবিলা করা যায়।

ছোট্টো একটি ঘটনা। একদিন একজন আদিবাসী কৃষক ইউনিয়ন অফিসে এসে কাঁদতে থাকেন — তিনি আর তার সঙ্গী শুকনো জ্বালানি কাঠ মাথায় করে আনছিলেন, বন-বিভাগের এক অফিসার ওদের মেরে কাঠ ছিনিয়ে নেয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই অন্য একজনকে বিক্রি করে দেয়। সেদিন 'হরিয়ালী' উৎসবের দিন ছিল, আদিবাসীদের বছরের প্রথম কৃষি-উৎসব, আর ওদের সপরিবারে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে।

ইউনিয়নের এক প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন অফিসারকে কোথায় পাওয়া যাবে?' কৃষক জবাব দেন, 'ও তো মদ খেয়ে বস্তিতে মস্তি করে বেড়াচ্ছে।'

ইউনিয়নের কয়েকজন সদস্য কৃষকের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ নিলেন এবং রাজহরা পুলিশ থানায় গিয়ে সি এস পি-র সঙ্গে দেখা করলেন। প্রথমে তো পুলিশ ঘটনাটি এড়িয়ে যেতে চায়, পরে ইউনিয়নের চাপে ঘটনাস্থলে গিয়ে বনবিভাগের অফিসারকে গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে আসে। সেদিন কিন্তু আলোচনা হলো না, কেন না অফিসারটির 'ফ্রেস' হওয়ার জন্য নিজের বাংলোয় যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় দিন থানায় বিস্তৃত আলোচনা হলো। আদিবাসীর অভিযোগ ছিল যে, বন-অফিসার প্রতি বান্ডিল কাঠের জন্য পাঁচ টাকা করে চায়, কিন্তু তা না দেওয়ায় কাঠ ছিনিয়ে নেয়।

বিভাগ অফিসার : এই লোকটা জঙ্গলের ক্ষতি করছে। আমাদের পরিবেশের সুরক্ষাও দেখতে হয়। আমরা তো এর ওপর কেসও চালাতে পারতাম।

ইউনিয়নের প্রতিনিধি : পাঁচ টাকা দিলে কি কাঠের বান্ডিল আইনসঙ্গত হয়ে যায়?

ব বি অ : এই পাঁচ টাকার অভিযোগ মিথ্যা।

সি এস পি : কারুর ওপর মিথ্যা অভিযোগ আনা উচত নয়।

ই প্র : এলাকার সমস্ত জঙ্গল গায়েব হয়ে গেছে। করাতকল-ওয়ালা, ঠিকাদার, রাজনৈতিক পার্টির নেতারা মিলে ট্রাকে কাঠ ভরে জঙ্গল সাফ করে দিল! ঐ সময় পরিবেশের ক্ষতি হয় নি? বে-আইনী কাজ হয় নি? আপনাদের সমস্ত আইনকানুন আদিবাসী ও গরীবদের ওপর বোঝার মতো চেপে আছে। আইনের রক্ষক যদি জঙ্গল এলাকার বাসিন্দাদের উৎপীড়নের কারণ হন, তাহলে ইউনিয়ন জন-আন্দোলনের মাধ্যমে জঙ্গল ও আদিবাসীদের সুরক্ষা করবে।

পৃথিবীর সবদেশের লোক পরিবেশের ব্যাপারে ভাবছেন। ইরাকের যুদ্ধের জন্য পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা জানি, বর্তমানকালে কয়েকটি আগ্নেয়গিরিও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আন্টার্কটিকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, মহাকাশে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হচ্ছে, আহত হচ্ছে পরিবেশ। এ-সময় কেবল আমার ঘরের পাঁচটি গাছ আর বস্তির কয়েক ডজন — কি পরিবেশ রক্ষা করবে!

ঐ দিনই আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন এক চ্যালঞ্জ স্বীকার করে নেয়। আর তারপর ইউনিয়ন এক নতুন শাখা গঠন করে, সেই শাখা 'আপনা জঙ্গল কো পহচানো' (নিজের জঙ্গলকে চেনো) স্লোগান দিয়ে এক নতুন আন্দোলন শুরু করে।

ইউনিয়ন নিজের ভাবনাকে দৃঢ় করে তুলল

বিতর্ক ও জন-আন্দোলনকে গঠনমূলক দিশা দেওয়ার জন্য প্রতি সপ্তাহে ইউনিয়ন অফিসে বৈঠক হতে থাকে। বেশ কতগুলি বৈঠকের পর কতগুলি ইস্যু নেওয়া হয় :

১. পরিবেশ বিনাশের কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

২. সামগ্রিকভাবে পরিবেশ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় চেতনার বিকাশ

করতে হবে।

৩. পরিবেশে জঙ্গলের প্রশ্নে — জঙ্গল এলাকার বাসিন্দাদের জঙ্গল-নির্ভর স্বার্থ সুরক্ষিত করতে হবে, যাতে তাদের মনে এই ভাবনা থাকে যে, জঙ্গল আমাদেরই সম্পত্তি।

৪. বর্তমান জঙ্গল-নীতির মাধ্যমে যে সব অন্যায় উপায় প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেগুলিকে পরিবর্তন করার যথাসম্ভব প্রয়াস নিতে হবে। এক বিকল্প পদ্ধতির প্রচার করে দৃঢ় জনমত গঠন করতে হবে।

৫. ব্যবস্থার বিকৃতির ওপর কঠোর আক্রমণ করা হবে এবং তার সাথে সাথে বিকল্প পরামর্শ হিসাবে নতুন রূপরেখা পেশ করা হবে।

৬. 'অপনে জঙ্গল কো পহচানো'-র মাধ্যমে নতুন ধরনের কার্যক্রম চলবে, যাতে করে জঙ্গলের সঙ্গে আমাদের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়।

৭. জল-প্রদূষণের ওপর আক্রমণ করা হবে এবং শুদ্ধ ও পরিষ্কার জলের জন্য সরকারের কাছে পর্যাপ্ত নলকূপ লাগানোর দাবি জানানো হবে।

৮. ধ্বনি-প্রদূষণের (Sound pollution) নিয়ন্ত্রণ কল্পে লাউড-স্পীকারের অত্যধিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রয়াস চলবে।

৯. ইউনিয়নের অগ্রণী কর্মীরা দেশ-বিদেশের পরিবেশ-আন্দোলন সম্বন্ধে খবরাখবর রাখবেন এবং আন্দোলনগুলির সমর্থনে ভ্রাতৃত্বমূলক আন্দোলনের অন্য সদস্যদের এবং জনসাধারণকে সামিল করবেন।

১০. যে সব শিল্প উদ্যোগে আমাদের ইউনিয়ন কাজ করছে সেখানে বিশেষ করে হাওয়ায় ধূলিকণার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যানেজমেন্টের কাছে দাবি জানানো হবে। তাছাড়া কর্মক্ষেত্রে ধ্বনি-প্রদূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হবে এবং ধ্বনি-প্রদূষণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য কার্যক্রম তৈরি করা হবে।

১১. পরিবেশ সুরক্ষার আড়ালে আমলা ও অফিসাররা যে বিপুল শ্রম ও ধনশক্তির ফালতু অপচয় করেন, তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে। পরিবেশ রক্ষার নামে মজদুর বিরোধী নীতি লাগু করার বিরোধিতা করা হবে, পরিবেশকে বিমূর্তভাবে দেখিয়ে উদ্যোগবিরোধী বাতাবরণ তৈরির প্রবল বিরোধিতা করা হবে।

মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার উত্তরে দুর্গ জেলার দক্ষিণ অংশে আমাদের এলাকা। কিল্লেকোড়া পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে দল্লী, ঝরনদল্লী, রাজহরা, মহামায়া পাহাড়গুলির মধ্যে দিয়ে এবং এলাকার আশেপাশে প্রবাহিত হচ্ছে তান্দুলা, সুখা, কিরিয়াকসা নালা। এই এলাকা লোহা আকরে ভরপুর, আর এখানেই এশিয়ার বৃহত্তম একটি উন্নত লোহাখনি অবস্থিত। আজ থেকে ৩৫ বছর আগে, যখন কেউ কুসুমকসা থেকে ডোন্ডী অথবা বস্তারের দিকে যেতেন তখন তাকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো। মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো আদিবাসী গ্রাম — অরসুরকসা, পুরকালকসা, অড়জাল প্রভৃতি গ্রামের নাম থেকে বোঝা যায় গ্রামগুলির বাসিন্দারা গোঁড় উপজাতির ছিলেন এবং গোঁড়ী ভাষায় তারা কথা বলতেন। সম্পূর্ণ এলাকা ছিল চমৎকার সবুজ-এর শোভায় মোড়া। কোকল, ঘুঘু এবং অন্য পাখিদের মধুর কলতানের সঙ্গে কিরিয়াকসা, ঝরন ও বোইরডিহি নালার বহমান জলের কলোচ্ছ্বাস মিশে এক সঙ্গীতময় বাতাবরণ সৃষ্টি করত। গ্রামে গ্রামে আদিবাসী বালক-বালিকার, নব যুবক-যুবতীর সমবেত নৃত্যে সাংস্কৃতিক তরঙ্গ উঠত।

তারপর একদিন, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার লোকজন এল। এল রুশ টেকনিশিয়ানদের সাথে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের দল। একদিন হঠাৎ জোর ব্লাস্টিং-এর আওয়াজ হলো। আদিবাসী গ্রামের লোক, জঙ্গলের পশুপাখি, সবুজ গাছগুলো কেঁপে উঠল। তারপর বারবার ব্লাস্টিং-এর আওয়াজ, বুলডোজার, ডাম্পারের ঘর্ঘর আওয়াজ। ময়ূর আর কোকিলেরা কে জানে কোথায় উড়ে গেল। আদিবাসীদের রিলৌ নাচ বন্ধ হলো। মাদলের আওয়াজ চুপ হয়ে গেল। লাখো লাখো ছোটো-বড় গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এলাকায় নতুন নতুন করাত-কল বসল, কাঠ চেরাই-এর জন্য।

সাধারণ মানুষের মন গাণিতিক পরিসংখ্যানে উদ্বেলিত হয় না। আবার যতক্ষণ না ভাবনা তার্কিক গাণিতিক রূপ পাচ্ছে, ততক্ষণ অবধি কর্মরূপী সৃষ্টিও অসম্ভব। তাই ভাবনা, আবেগ আর যুক্তি-তর্কের মিলনেই তৈরি হবে পরিবেশের ওপর জাতীয় চেতনা।

কিরিয়াকসা নালা, ঝরন নালার জল লোহা আকরের ফাইন্সের সাথে মিশে রক্ত লাল হয়ে গেল; যেখানে দেখা যায়, সেখানেই লাল জল।

তারপর আরেক দিন। তখন জঙ্গল তো দূরের কথা, গাছের চিহ্ন অবধি মুছে গেছে। এলাকার করাত-কল মালিক ও রাজনাদগাঁও, দুর্গ, রায়পুরের বড় ব্যবসায়ীরা আদিবাসী গ্রামের ওপর বড় বড় মহল লাগাল। লোহাপাথর উৎপাদন শুরু হলো। রাজহরার লোহাপাথর ভিলাই-এর ব্লাস্ট ফার্নেসে গলে ইস্পাত কারখানার চিমনি দিয়ে ফেরাস অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড বার করে 'বিকাশের পতাকা' ঊর্ধে তুলে ধরল।

বিনাশের ধ্বংসলীলার বুনিয়াদে বিকাশের নতুন প্রাসাদ গড়ে উঠল। তারপর সিমেন্ট কারখানা তৈরি হলো। আশপাশের ক্ষেতে সিমেন্ট কণা পড়া শুরু হলো। একের পর এক কারখানা

কৃষকের ক্ষেতের হরিয়ালী গ্রাস করতে লাগল, লাখো কৃষক মাথা চাপড়াতে লাগলেন। তারপর ডিস্টিলারির পচা গুড়ের দুর্গন্ধ। সার কারখানা, ডিস্টিলারি, মেইজ ফ্যাক্টরির তরল বর্জ্য পদার্থে খারুন ও শিবনাথ নদীর জল বিষাক্ত হলো। গ্রামে গ্রামে চর্মরোগ দেখা দিল। গবাদি পশুর মৃত্যুহার অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেল। শহরের জনসংখ্যাও বাড়ছিল। শহরের দুর্গন্ধময় বাতাবরণে চারিদিকে ভারী ভারী মেসিনের আওয়াজ। মেসিনের থেকে পড়া তেল আর অ্যাসিড মেশা জল ব্যবহার করতে বাধ্য হলেন হাজারো বস্তিবাসী, বাধ্য হলেন কৃমিকীটের জীবন-যাপন করতে।

এমন অবস্থায় পরিবেশ সুরক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দেখা দেয়। আমাদের সামনে এক নতুন চ্যালেঞ্জ এসে দাঁড়ায়।

২. অসম বিকাশ এবং কৃত্রিম উপায়ে চেতনা আসে না

'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' আজ আর ময়ূর পেখম মেলে না। জঙ্গলের গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে। অন্যদিকে কংক্রিটের জঙ্গল প্রতিদিন শাখা-প্রশাখা বাড়িয়ে চলে। ইটের কাঠামো আর লোহার খাঁচায় মানুষের এক নতুন দুনিয়া তৈরি হয়। যেখানে মানুষ টেলিভিশনে নদী বা সমুদ্র দর্শন করে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর সেরা সেরা সৌন্দর্য দেখা হয়ে যায়। বড় বড় কোম্পানির অফিসে আদিবাসী যুবতীদের অর্ধনগ্ন চিত্র বা বনের অয়েল পেইন্টিংকে লোকে আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। ক্লান্ত হলে দার্জিলিং-এর টাইগার হিল-এ সূর্যোদয় দেখে আসেন অথবা সমুদ্রতটে আরব সাগরে সূর্যাস্ত দেখে আসেন।

আমাদের দেশের মানুষকে ভালবাসাকে দেশপ্রেম বলা হবে, দেশের প্রকৃতিকে ভালবাসাকে দেশপ্রেম বলা হবে। যে বিজ্ঞান প্রকৃতিকে হত্যা করবে না — সেই বিজ্ঞানকে আমরা 'আমাদের বিজ্ঞান' বলব।

গ্রামে রাত নামে। শীতের মাসগুলিতে আগুন জ্বালিয়ে আদিবাসীরা নাচতে থাকেন। ঢোলকের শব্দে নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। আদিবাসী গ্রামের যুবক-যুবতীর গান — 'তোমরা শহরের বাবুরা যখন ঘুমিয়ে আছ, তখন আমরা চাঁদকে সঙ্গী করে নেচে চলেছি।'

কত না পার্থক্য। আর যখন ট্রাকে ভরে সারা জঙ্গল শহরে চলে যায়, বাঁশ পৌঁছায় কাগজ-মিল-এ, তখন বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে, কী, কীভাবে পরিবেশ বিষয়ে এক রাষ্ট্রীয় চেতনা বিকশিত হবে।

আজ পৃথিবী খুব ছোটো হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সবদেশের লোক পরিবেশের ব্যাপারে ভাবছেন। ইরাকের যুদ্ধের জন্য পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা জানি, বর্তমানকালে কয়েকটি আগ্নেয়গিরিও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আন্টার্কটিকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, মহাকাশে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হচ্ছে, আহত হচ্ছে পরিবেশ। এ সময় কেবল আমার ঘরের পাঁচটি গাছ আর বস্তির কয়েক ডজন — কি পরিবেশ রক্ষা করবে!

একদিকে রাষ্ট্রীয় অসম বিকাশের ধারা আর অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ঘটনা, আর পরিবেশের ওপর তাদের প্রতিকূল প্রভাব — আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে জাতীয় চেতনা কুণ্ঠিত হয়ে যায়।

সাধারণ মানুষের মন গাণিতিক পরিসংখ্যানে উদ্বেলিত হয় না। আবার যতক্ষণ না ভাবনা তার্কিক গাণিতিক রূপ পাচ্ছে, ততক্ষণ অবধি কর্মরূপী সৃষ্টিও অসম্ভব। তাই ভাবনা, আবেগ আর যুক্তি-তর্কের মিলনেই তৈরি হবে পরিবেশের ওপর জাতীয় চেতনা।

ইউনিয়ন তাই 'পরিবেশ'-এর জায়গায় 'প্রকৃতি' শব্দটিকে বেছে নিয়েছে। এই প্রকৃতি, আমাদের এলাকার প্রকৃতি, শত শত বছর ধরে আমাদের পূর্বজদের জন্মের আগের থেকেই এই প্রকৃতি রয়েছে। আমাদের পূর্বজরা যে হাওয়ায় শ্বাস নিতেন, যে নদীর জলে তারা পিপাসা নিবারণ করতেন, সেগুলিকে নষ্ট করার অধিকার আমাদের নেই। এই নদী, এই হাওয়া, এই পাহাড়, এই জঙ্গল, পাখির কলকাকলি — এই তো আমাদের দেশ। আমরা বিজ্ঞানের সহায়তায় দুনিয়াকে প্রগতির পথে তো অবশ্যই নিয়ে যাব, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যে, নদীর স্বচ্ছজল যেন কলকল শব্দে বইতে থাকে; তাজা, শুদ্ধ হাওয়া যেন আমাদের তরতাজা করে রাখে; আমরা যেন কানে সেই পাখিদের আওয়াজ শুনতে পাই, যারা গান গেয়ে গেয়ে আমাদের পূর্বজদের প্রকৃতি-প্রেমী করেছিল।

তাহলেই কেবল, আমাদের দেশের মানুষকে ভালবাসাকে দেশপ্রেম বলা হবে, দেশের প্রকৃতিকে ভালবাসাকে দেশপ্রেম বলা হবে। যে বিজ্ঞান প্রকৃতিকে হত্যা করবে না — সেই বিজ্ঞানকে আমরা 'আমাদের বিজ্ঞান' বলব। আর এভাবেই বিকশিত হবে পরিবেশ সম্বন্ধে জাতীয় চেতনা।

৩. ব্যক্তিহিত, সমষ্টিহিত, দেশহিত

আমরা জানি, জঙ্গল এলাকা থেকে কয়েক-শ কিলোমিটার দূরের বাসিন্দা ব্যবসায়ী সেজে জঙ্গল এলাকায় আসে, আর জঙ্গলকে লুটে ধনী হয়ে যায়। এরা শহরের গণ্যমান্য নাগরিকের সম্মান পায়। সরকারি অফিসারদের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। এদের নিকট-আত্মীয়রা রাজনৈতিক পার্টিগুলির গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়ে থাকে। এ সব ব্যবসায়ীরা কেউ ট্রাক মালিক, কেউ করাত-কল মালিক, কেউ কাঠের ডিপোর মালিক, কেউ বা বনবিভাগের ঠিকাদার। জঙ্গল থেকে এদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ হয়, এদের প্রতিটি ঝর্যকলাপ নিজেদের ব্যক্তিহিতের অনুকূল হয়।

ভারতের জঙ্গল এলাকাগুলির সাধারণ বাসিন্দারা সাধারণত আদিবাসী। জঙ্গল থেকে আদিবাসীরা কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থ উন্নীত করতে পেরেছেন বলে দেখা যায় না। জঙ্গল থেকে দিন গুজরান করতেও এদেরকে সরকারি অফিসারের পায়ে পয়সা বা মুর্গী ভেট দিতে হয়।

সমষ্টিহিত এবং দেশহিতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার কথা, কেন না দেশে নিহিত আছে 'জন' শব্দ, জনতা। জনহিত বা সামুহিক অর্থাৎ সমষ্টিহিত ও দেশহিত একে অন্যের পরিপূরক হওয়ার কথা।

জঙ্গল আইন বানানোর সময় আদিবাসী এলাকার সামুহিকহিতের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ১৯১৭ সালে ইংরেজ সর্বপ্রথম জঙ্গল আইন বানায়। আর তার পরই অনর্থ শুরু হয়। জঙ্গল এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় অরণ্যের অধিকার। জঙ্গলকে যারা 'আমাদের জঙ্গল' বলতেন, জঙ্গলের বিনাশে যারা সবচেয়ে বেশি ব্যাকুল হতেন, যাদের পূর্বপুরুষ জঙ্গলকে রক্ষা করে এসেছেন — জঙ্গল আইন আঘাত হানল সেই আদিবাসীদের ওপরই। তাই জঙ্গলের আজ মা-বাপ নেই। আমলাতন্ত্র যান্ত্রিকভাবে জঙ্গল আইনকে প্রয়োগ করে বাস্তবিকই 'জঙ্গলের রাজ' কায়েম করেছে।

জঙ্গল আইনের সংশোধন তো করতেই হবে। স্পষ্টভাবে জঙ্গল চোরদেরও চিহ্নিত করতে হবে। জঙ্গল এলাকার কোটিপতিদের তালিকা বানাতে হবে। এসব লোকদের শায়েস্তা করার জন্য আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে; আর আইনকে কার্যকর করার জন্য জঙ্গল এলাকার প্রতিটি গ্রামের বাসিন্দাদের সহায়তা অত্যাবশ্যক।

তেঁদু পাতা, তেঁদু, বেল, চার, সালবী, মহুয়া, বাঁশ, দোনা বানানোর পাতা, জঙ্গলী বের (যাতে রেশম কীট পালন হয়), পলাশ (যাতে লাক্ষা কীট পালন হয়) এবং বিভিন্ন প্রকার ওষধি ফুল, পাতা ইত্যাদির ওপর জঙ্গলবাসীদের অধিকার ও আইনগত সংরক্ষণ হওয়া উচিত।

জঙ্গলের নিকটবর্তী গ্রামগুলির কৃষকদের প্রয়োজন মতো জ্বালানি কাঠ তাদের জঙ্গল থেকেই আইনসঙ্গতভাবে পাওয়া উচিত। আদিবাসীদের ঘর বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঠও আইনসঙ্গতভাবে আশেপাশের জঙ্গল থেকে পাওয়া উচিত। প্রয়োজনে এ সবের জন্য নির্ধারিত মূল্য নেওয়া যেতে পারে।

বর্তমান আইনে এ সব ব্যবস্থা কিছু কিছু পরিমাণে স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু আইনি প্রক্রিয়া এত জটিল এবং আইন বাস্তবায়িত করার জন্য নিযুক্ত অফিসারদের অকর্মণ্যতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং অত্যাচারী প্রবৃত্তির জন্য আদিবাসীরা আইনি সুবিধা পান না। বনবিভাগের অফিসারদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বাড়তেই থাকে। জঙ্গল আইনে জঙ্গল এলাকার বাসিন্দাদের সামুহিকহিতকে সুনিশ্চিত করতে হবে। যদি তা সুনিশ্চিত করা যায় তাহলে 'আমাদের জঙ্গলকে আমরা রক্ষা করব' এই ভাবনা থেকে জঙ্গল এলাকার ছোটো শিশুও জঙ্গলের প্রতি পাহারাদারের নজর রাখবে। চোরদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হবে। অকর্মণ্য ও অত্যাচারী আমলাদের অন্যায় দূর করা যাবে। জঙ্গলে একটি কুড়ালের অন্যায় আঘাতে সেদিন সমস্ত জঙ্গল চেঁচিয়ে উঠবে, কেন না তখন জঙ্গল জনহিতের একটি সাধন হবে। জনহিতের সঙ্গে সঙ্গে দেশের হিত রক্ষা হবে, আর পরিবেশ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানবতা রক্ষারও গ্যারান্টি পাওয়া যাবে।

ইউনিয়ন এ সব বিষয়ে বার বার দাবি জানিয়েছে, অফিসারদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে। মাঝে মাঝে এ সব বিষয় নিয়ে জন-আন্দোলনও গড়ে উঠেছে, আদিবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার প্রয়াস হয়েছে। জঙ্গল থেকে চুরি ঠেকাবার চেষ্টাও হয়েছে।

প্রায় বছর দশেক আগেকার ঘটনা। সাল্‌হেটোলা গ্রামের বাসিন্দারা খুব মুশকিলে পড়েন। ঝলমলা গ্রামের করাত-কল মালিক তাদের গ্রামের জঙ্গল থেকে সেগুন গাছ কেটে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা বনবিভাগ, পুলিশ এবং রাজনৈতিক নেতাদের কাছে অনেকবার অভিযোগ করেও কোনো ফল পান নি।

ইউনিয়ন গ্রামবাসীদের একটি পরামর্শ দিল। গ্রামবাসীরা ধুমধাম করে বৃক্ষরোপণ ও বনমহোৎসব পালন করলেন। তারপর থেকে জঙ্গল চোর আর সেই জঙ্গলের রাস্তা মাড়ায় নি।

৪. সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিই পরিবেশের রক্ষাকবচ হতে পারে

শিল্পোদ্যোগ বিকাশের সাথে সাথেই আমরা পরিবেশ সুরক্ষা, জঙ্গলের গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয়কে চিনতে শিখেছি। ধোঁয়া, গ্যাস উগরানো কারখানাগুলি বায়ুমণ্ডলের যে ক্ষতি করে, জঙ্গলই কিছুদূর অবধি তার ভারসাম্য বজায় রাখে।

কিন্তু ভারসাম্য রক্ষাকারী জঙ্গলই যদি শিল্পোদ্যোগের খাদ্য অর্থাৎ কাঁচামাল হয়ে যায়, তাহলে কিভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষিত হবে? বর্তমান বননীতির ফলে দ্রুততার সঙ্গে ইউক্যালিপ্‌টাস, নীলগিরি, পাইন প্রভৃতি গাছ লাগানো হচ্ছে, এ সবে শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজন তো মিটছে, কিন্তু বনের বিনাশ আটকানো যাচ্ছে না। এই নীতিতে মোনো কালচার রোপণের একটি ভুল প্রবৃত্তিও আছে, যার বিরুদ্ধে ইউনিয়ন বার বার সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ করেছে। কেবল পাইন গাছ রোপণের বিরুদ্ধে তো ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। সেগুনের মোনো কালচার রোপণও একই রকম ক্ষতিকর। দেখা গেছে, যেখানে সেগুনের পাতা ঝরে পড়ে সেখানে ঘাসও হয় না।

ইউনিয়ন বনবিভাগকে বার বার নিজের পরামর্শ জানিয়েছে।

এভাবে আমরা 'নিজেদের জঙ্গলকে জানো' কার্যক্রমে আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুর সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছি। আমরা চেষ্টা করছি এই পরিচয়ের গন্ডি জনসাধারণের মধ্যে বাড়িয়ে পরিবেশ সুরক্ষার গ্যারান্টি তৈরি করতে।

মোনো কালচার বৃক্ষরোপণের ওপর বনবিভাগ খুব জোর দেয়, বিশ্ব ব্যাঙ্কও এ বাবদে সাহায্য দেয়। এই বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি কিন্তু বিভিন্ন প্রথাগত গাছের জঙ্গল কাটা চলতেই থাকে। এ সব গাছ কেটে বনবিভাগের ডিপোতে জমা করা হয়। কাটা গাছগুলিকে বনবিভাগের 'উৎপাদন' হিসাবে দেখানো হয়, প্রতি বছর আগের চেয়ে বেশি 'উৎপাদন লক্ষ্য' ধার্য করা হয়, আর উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা পুর্তির ওপর অফিসারদের কর্মকুশলতা বিচার করা হয়। যতদিন অবধি 'উৎপাদন'-এর এই ধারণা থাকবে, ততদিন অবধি বন-বিনাশ হতেই থাকবে।

মহুয়া, চার, তেন্দু প্রভৃতি গাছ কাটার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত। নিষেধাজ্ঞা থাকলে স্বাভাবিক প্রজননের মাধ্যমে এ সব গাছের সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং জঙ্গল এলাকার বাসিন্দাদের জঙ্গল নির্ভর অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় থাকবে, জঙ্গলের সুরক্ষার গ্যারান্টিও পাওয়া যাবে। নিরন্তর গবেষণা হওয়া উচিত। উপযোগী জড়ি-বুটির সন্ধান চালালে জড়ি-বুটিগুলি (Herbs) রক্ষা পাবে।

সংরক্ষিত বন বা অভয়ারণ্যগুলিতে প্রায়শই শোনা যায় যে, বাঘ বা চিতা নরখাদক হয়ে গেছে। অন্য রাজ্য থেকে বাঘ মারার জন্য শিকারী আনানো হয়, এক নরখাদককে মারার নামে অনেক বাঘ বা চিতার প্রাণ যায়। বাঘের নরখাদক হওয়াও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। জঙ্গলী বরাহ, হরিণ, খরগোশ প্রভৃতি জানোয়ার সংখ্যায় কমে গেলে খাদ্যের অভাবে বাঘ নরখাদক হয়। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। ইউনিয়ন এই লক্ষ্যে কাজ করার চেষ্টাও চালাচ্ছে।

পরিবেশের নামে শোরগোল তো অনেক হচ্ছে, কিন্তু স্থায়ীভাবে কিছু করে ওঠবার কল্পনা দূরেই থেকে যাচ্ছে। পরিবেশের সুরক্ষার জন্য স্থায়ী এবং নিরন্তর কার্যক্রম জরুরি। এ কাজে স্থানীয় মানুষদের যুক্ত করে তাদের মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষার ভাবনা গড়ে তোলা আবশ্যক। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে আদিবাসী এলাকার জনতার ক্রয় ক্ষমতা বাড়লে এসব অনুন্নত এলাকার বিকাশের দরজাও খুলে যেতে পারে।

শালবন সব জায়গায় হয় না, বিশেষ বিশেষ পরিবেশেই এই দুর্লভ বন দেখা যায়। কিন্তু খুব চিন্তার বিষয় যে, বড় বড় বাঁধ (যেমন কি না বস্তারে বোধঘাট বাঁধ) বানিয়ে এসব বনের বিনাশ করা হচ্ছে। আমাদের ইউনিয়ন যে সব কারণে বোধঘাট পরিযোজনার বিরোধিতা করেছে তার একটি হলো এতে শালবন নষ্ট হবে।

বেশ কয়েকবছর আগে রাজনাদগাঁও জেলায় যখন মোংগরা বাঁধ বানানোর প্রয়াস হয়, তখনও আমাদের সংগঠন প্রবল প্রতিরোধ করে, কেন না এতে প্রচুর বন নষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল। এই প্রতিরোধ আন্দোলনে ইউনিয়নের সদস্য এক শ্রমিক কবির গান — 'মোংগরা কে বাঁধ বনন দেবো নহীঁ ভাইয়া' — এলাকার আদিবাসীদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল।

ইউনিয়ন অফিসের পাশে এক ছোট্টো জঙ্গলকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিকশিত করে ইউনিয়ন তার বিকল্পের ধারণাকে সাকার করার প্রয়াস হয়েছে। পরে এ সম্বন্ধে বলব।

এমন কিছু বিষয় আছে যা সাধারণ মানুষ তো সহজেই বুঝতে পারেন, কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমান অফিসারদের মাথায় তা ঢোকানো যায় না। মনে করুন — জঙ্গল এলাকার আদিবাসীরা দাবি জানালেন যে, অমুক নদীতে স্টপ ড্যাম বানিয়ে জল সেচের ব্যবস্থা করা হোক। রাজস্ব বিভাগের অফিসার খালি জমিতে স্টপ ড্যাম তৈরির অনুমোদন করলেন, আর তখনই বনবিভাগ সতর্ক হয়ে ওঠে এবং বাঁধ-এ তার 'আপত্তি' হতে থাকে। ঐ বাঁধ তৈরি হলে হয় তো আশেপাশে এক সুন্দর জঙ্গল হতে পারত, জঙ্গলী জানোয়ারদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা হতে পারত। অথচ বনবিভাগ ঐ বাঁধ নির্মাণে বাধা দিয়ে বসে।

অথচ বড় বাঁধ নির্মাণের সময় জঙ্গলের উৎপাদন (গাছ কাটা থেকে) বাড়বে, জঙ্গল ব্যবসায়ীদের লাভ হবে, তাই বিকাশের ছাপমারা বড় বাঁধ কিন্তু সহজেই বনবিভাগের অনুমোদন পেয়ে যায়।

আমাদের সংগঠন এলাকার বেশ কয়েকটি ছোটো-ছোটো বাঁধ নির্মাণে আদিবাসী জনতাকে নেতৃত্ব দিয়েছে। কুয়াগোঁদি, কুংগেরা প্রভৃতি কয়েকটি জায়গায় স্টপ ড্যাম বানাতেও পেরেছে।

বর্ষার জল লোহাখনির ফাইন্স মাটিকে বয়ে এনে কৃষি জমি বা জঙ্গলের উর্বরা জমির এপর এনে ফেলে। এই ফাইন্স, জমির 'টপসয়েল'-এর স্তর হয়ে জমির শ্বাসরুদ্ধ করে, উর্বর জমি যে অনুর্বর মরুভূমি হয়ে যায়। অথচ সরকারি কোনো বিভাগ এ সব নিয়ে চিন্তিত নয়।

মহামায়া লোহাখনির প্রবহমান ফাইন্স এমনভাবেই আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের কৃষিভূমি ও বনভূমির উর্বরতাকে গ্রাস করছিল। ইউনিয়ন এক জন-আন্দোলন গড়ে তোলে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পান এবং পাহাড় থেকে নেমে

আসা জল-নিকাশের জন্য বুলডোজার দিয়ে রাস্তা বানানো হয়।

সাধারণত সরকারি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বোঝা-পড়ার অভাব দেখা যায়, ফলে অনেক নতুন পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। গ্রামে খাস জমি, ঘাস-জমি সবসময়ই বিবাদগ্রস্ত থাকে। গ্রামের প্রভাবশালী মানুষেরা প্রত্যেক বছর কিছু কিছু করে এ-সব জমি গ্রাস করতে থাকে। এ সব জমি নিয়ে গ্রামে সাধারণত কিছু দল-উপদল গড়ে ওঠে, মাঝে মাঝে তো খুন-খারাপিও হয়ে যায়।

অথচ রাজস্ববিভাগ ও বনবিভাগ বোঝাপড়া করে এ সব পতিত জমিতে উপযুক্ত গাছ লাগাতে পারেন। এ সব জমিকে গবাদি পশুর চারণক্ষেত্র হিসাবে যদি বিকশিত করা যায়, তাহলে 'অপারেশন ফ্লাড' হয়তো সত্যি সত্যিই দুধের গঙ্গা বইয়ে দিতে পারে। কিন্তু কে এসবের দায়িত্ব নেবে? কেবল জন-আন্দোলন তো এই কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে না, তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থার কর্ণধার হয়ে বসা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিদেরও সংবেদনশীল পরিবেশমুখী ভাবনায় অনুপ্রাণিত হতে হবে। ইউনিয়ন এই কাজেও প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিবেশের নামে শোরগোল তো অনেক হচ্ছে, কিন্তু স্থায়ীভাবে কিছু করে ওঠবার কল্পনা দূরেই থেকে যাচ্ছে। পরিবেশের সুরক্ষার জন্য স্থায়ী এবং নিরন্তর কার্যক্রম জরুরি। এ কাজে স্থানীয় মানুষেদের যুক্ত করে তাদের মধ্যে পরিবেশ-সুরক্ষার ভাবনা গড়ে তোলা আবশ্যক। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে আদিবাসী এলাকার জনতার ক্রয়-ক্ষমতা বাড়লে এ সব অনুন্নত এলাকার বিকাশের দরজাও খুলে যেতে পারে। এভাবে স্থায়ী এক কার্যক্রমের জাল সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেখানে একটি পুলিশ চৌকি আছে, সেখানে একটি পরিবেশ চৌকিও বসানো উচিত। আমাদের দেশের পনেরো কোটিরও বেশি রোজগারহীন মানুষের মধ্যে সাড়ে আট কোটিকে পরিবেশ-বিভাগের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। এই বিভাগে এছাড়াও সংবেদনশীল পরিবেশ-প্রেমীদের নিয়োগ করতে হবে।

৬. নিজেদের জঙ্গলকে চেনো / নিজের পরিবারকে জানো

মনে করুন, আমাদের এক নিকট আত্মীয়, যাকে আমরা কোনোদিন দেখিই নি, তিনি মারা গেলে আমরা ততটা ব্যাকুল হই না। অথচ পাড়ার এক জানাশোনা অনাত্মীয় মানুষের মৃত্যুসংবাদ আমাদের বিচলিত করে। নিজেদের জঙ্গলকে চেনা ও তার প্রতি আকর্ষণের মধ্যে সম্বন্ধটাও অনেকটা এইরকম। আমি জঙ্গলকে চিনি না, কুড়ুলের ধার পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি একটা তিন বছরের শিশু সেগুনকে হত্যা করি। জঙ্গলের সঙ্গে অপরিচয়ই এর কারণ। এই উপলব্ধি থেকে প্রায় সাত বছর আগে ইউনিয়ন 'অপনে জঙ্গল কো পহচানো' নামে একটা ছোটো কার্যক্রম হাতে নেয়। এই কার্যক্রমে আছে :

ক. এলাকার জঙ্গলের উপযোগী গাছগুলি বেছে নিয়ে রোপণ করা হয় যেমন — বাঁশ, সলফি, মহুয়া, আম, জাম, কাঁঠাল, সিসম, বেল, সেগুন, নিম ইত্যাদি।

খ. কিছু গাছ যেমন চন্দন, কাজু, ইউক্যালিপ্টাস-এর বিভিন্ন প্রকার, যেগুলি সাধারণত প্ল্যান্টেশনে লাগানো হয়, সেগুলিকেও এই ছোটো জঙ্গলে লাগানো হয়।

গ. স্থানীয় ও বাইরে থেকে আনা বিভিন্ন প্রকারের বাঁশ লাগানো হয়।

ঘ. 'আবার জঙ্গলকে ফিরিয়ে দাও' কার্যক্রমে লেবু, অড়হর (এক ধরনের অড়হর, যার গাছ তিন-চার বছর থাকে), করঞ্জ, করোন্দা প্রভৃতিও লাগানো হয়। এছাড়া কদম্ব, বাদাম, রেনট্রি, নারকেল প্রভৃতি গাছও লাগানো হয়।

সাত বছরে এটি একটি ছোটো জঙ্গল রূপায়িত হয়। আজ ইউনিয়নের সদস্যরা একে 'নিজেদের জঙ্গল' বলে গৌরব বোধ করেন। ফলে :

১. এই পরীক্ষায় ইউনিয়ন অফিসের পাশে পড়ে থাকা ফালতু ঘাস জমি কাজে আসে।

২. শ্রমিক সাথীরা বৃক্ষরোপণে উৎসাহ পান, তারা নিজেদের ঘরে ঘরেও গাছ লাগাতে থাকেন। যে মজদুর বস্তিতে আগে সবুজ রঙ নজরে আসত না, সেখানে আজ লাখ লাখ গাছ বেড়ে উঠেছে।

আমরা সরকারি প্ল্যান্টেশন কার্যক্রম সম্বন্ধেও নিজেদের উপলব্ধি গভীর করে তুলতে পারি। আমরা দেখি যে, সরকারি প্ল্যান্টেশনে সাধারণত লাগানো গাছগুলির মধ্যে ৪০% বেঁচে থাকে, বাকি ৬০% নষ্ট হয়ে যায়। এর কারণ সাধারণত মানুষ গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করেন না।

সাধারণ মানুষের সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে প্ল্যান্টেশনের কায চালানো হয় তাহলে প্ল্যান্টেশনের চেহারা এরকম হতে পারে :

১. বাঁশ ঝাড়	১৫%	এই বাঁশ স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘর বানাতে কাজে লাগবে
২. স্থানীয় বনোপজ উৎপাদনকারী গাছ	৩৫%	চার, মহুয়া, বেল, আমলকি ইত্যাদি
৩. অন্যান্য উপযোগী গাছ	২০%	অড়হর, বাদাম, কাজু, চন্দন, নিম, জাম, আম ইত্যাদি
৪. সরকারি প্রকল্পের গাছ	৩০%	যে সব গাছ বনবিভাগ প্ল্যান্টেশনে লাগায়
মোট এলাকা	১০০%	

'নিজেদের জঙ্গলকে চেনো' কার্যক্রমে ইউনিয়ন যে সব গাছ লাগায়, তার বড় অংশ আজ বড়-সড় হয়ে গেছে। গাছগুলিতে এক একটি বোর্ড লাগানো আছে, যাতে গাছের স্থানীয় নাম, হিন্দী নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম লেখা আছে। স্কুলের শিক্ষার্থী এ সব জ্ঞান নিয়ে নিজের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার জ্ঞানকে পাকাপোক্ত করে।

এ সব গাছগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে ছোটো ছোটো পুস্তিকা প্রকাশনের জন্য ইউনিয়ন বর্তমানে উদ্যোগ নিচ্ছে।

এভাবে আমরা 'নিজেদের জঙ্গলকে জানো' কার্যক্রমে আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুর সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছি। আমরা চেষ্টা করছি এই পরিচয়ের গন্ডি জনসাধারণের মধ্যে বাড়িয়ে পরিবেশ সুরক্ষার গ্যারান্টি তৈরি করতে। তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, সমস্ত কার্যক্রমটি ইউনিয়ন তার সীমিত সাধ্যের মধ্যে করছে।

৭. প্রকৃতি আমাদের এক জলস্রোত দিয়েছিল

দল্লী-রাজহরার বাসিন্দারা শত শত বছর ধরে দল্লী নালা ও ঝরন নালা থেকে নিজেদের জলের প্রয়োজন মেটাতেন। স্থানীয় গোঁড় উপজাতিরা এই প্রাকৃতিক নালাগুলির ওপরই পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। নালাগুলি কিভাবে জনজীবনকে প্রভাবিত করত তার প্রমাণ মেলে গ্রামগুলির নাম থেকে। যেমন ঝরনটোলা, অরপুরকসা (অর-পুর-কসা অর্থাৎ জলের ধারে ছোটো গ্রাম)।

দল্লী-রাজহরার হাজারো শ্রমিক এবং আশেপাশের হাজারো আদিবাসী আজও দৈনন্দিন জীবনে এই নালাগুলির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দল্লী ক্রাশিংপ্ল্যান্ট ওর-অয়াশারি-র জন্য নালার জল প্রদূষিত হতে লাগল। এই জল প্রদূষণের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন দাবি জানায়। সামান্য লাভ হয় — লাল জলের রঙ বদলে, কমলা রঙ হয়।

ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে দল্লী-রাজহরার শ্রমিক বস্তিগুলিতে ১৯৮৮-৯০ এই দেড় বছরে ৮৯টি নলকূপ বসানো হয়। এছাড়া আশেপাশের গ্রামগুলিতেও এ ধরনের নলকূপ বসানোতে পানীয় জলের কিছুটা সুবন্দোবস্ত হয়েছে।

কেডিয়া ডিস্টিলারিজ লিমিটেড নামক মদের কারখানা শিবনাথ নদীর জলকে প্রদূষিত করে। এর বিরুদ্ধে ব্যাপক জন-আন্দোলন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই আন্দোলনের শুরুর পর্যায়েই ব্যাপক সংখ্যার শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও পরিবেশপ্রেমী সামিল হয়েছেন।

৮. শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি বনাম ধ্বনি প্রদূষণ

পনেরো বছর আগে দল্লী-রাজহরার কোনো শ্রমিক যখন দৈনিক তিন টাকার বেশি বেতন পেতেন না, তখন কিন্তু ধ্বনি প্রদূষণ সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করত না। ইউনিয়নের লাগাতার আন্দোলনের ফলে আজ শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক বেতন ৭০ টাকার বেশি। এর সঙ্গে সঙ্গে শহরে অনেক মাইকের দোকান, প্রতিটি পাড়ায়, অলি-গলিতে ফিল্মী গানের ক্যাসেট, লাউড স্পীকারের তারস্বরে আওয়াজ। শিশু জন্মের আনন্দ উৎসব হোক অথবা বিবাহ, অথবা সত্যনারায়ণের ব্রতকথা অথবা অন্য কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান — লাউড-স্পীকারের ব্যবহার এক অনিবার্য প্রথা হয়ে ওঠে। দোকানদাররাও মালের বিজ্ঞাপনের জন্য মাইক্রোফোন ব্যবহার শুরু করে। চরম ধ্বনি-প্রদূষণ চলতে থাকে।

ইউনিয়ন তার মুহল্লা-সমিতিগুলির মধ্য দিয়ে, শহীদ হাসপাতালের শ্রমিক-স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় সাধারণ মানুষেকে ধ্বনি প্রদূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। শহরের দোকানদারদের বোঝানোর চেষ্টাও চলছে।

৯. আমরা অন্যদের কথা শুনব/আমরা অন্যদের কাছে শিখব

যুগ যুগ ধরে কবি ও লেখক প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। আমাদের দেশ ও বিদেশের লোককথা-য় এরকম অনেক উদাহরণ আছে। এ সব রচনা সম্বন্ধে জ্ঞান পরিবেশ সুরক্ষার ভাবনার বুনিয়াদ তৈরি করতে পারে।

আজ দেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞানী অনেক পরিসংখ্যান, তথ্য হাজির করে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে গভীর চিন্তা ব্যক্ত করছেন। আমাদের ইউনিয়ন মিটিংগুলিতে এ সব বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে সহজ ভাষায় আলোচনা করে শ্রমিকরা তাদের যুক্তিকে আরও মজবুত ভিত্তি দেন। এ ছাড়া কিছু কিছু পরিবেশ-আন্দোলন সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান আমরা আহরণ করি। প্রকৃতির শত্রুরা টিহরী বাঁধ বানিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করতে চায়। আমরা তখন পণ্ডিত সুন্দরলাল বহুগুনার বিচার ও কার্যক্রমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাঁধ বিরোধী আন্দোলনের সহভাগী হয়ে যাই। 'চিপ্‌কো আন্দোলন' আমাদের পুলকিত করে, আমরা এই আন্দোলনকে এক বিপ্লবী আন্দোলনের মর্যাদা দিই। যখন নর্মদা উপত্যকার 'বাঁধ নহী বনেগা' আন্দোলন শুরু হয়, আমাদের সংগঠনের অনেক সদস্য উপত্যকা অঞ্চলে গিয়ে বাবা আমতের নেতৃত্বে আন্দোলনে সামিল হন। কেরালার 'সায়লেন্ট ভ্যালী' আন্দোলনে পরিবেশ-প্রেমীদের সফলতা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান জনতার প্রকৃতি প্রেম, প্রকৃতি ও জন্মভূমিকে একাকার করে দেখার ভাবনার সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে যাই। ইউনিয়ন অফিসে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়। শ্রমিকরা সৌহার্দ্যমূলক আন্দোলন করেন, পরিবেশ-প্রেমীদের নিজের পরিবারের সদস্য মনে করে তাদের প্রতিবাদের আওয়াজে আমরা আওয়াজ মেলাই।

১০. মজদুররা ম্যানেজমেন্টকে বাধ্য করালেন

পরিবেশের প্রতি ইউনিয়নের সচেতনতাকে ভিলাই ইস্পাত কারখানার ম্যানেজমেন্ট আজ আর উপেক্ষা করতে পারে না।

প্রথম প্রথম তো ম্যানেজমেন্ট কাউকে পরোয়াই করত না। খনিতে সবসময় ধুলো উড়ত, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে খনির কাঁচা রাস্তায় ট্রাক বা ডাম্পার চললে খুব ধুলো উড়ত। শ্রমিকদের মধ্যে সিলিকোসিস দেখা যেত। ইউনিয়ন এ বিষয়ে কাজ শুরু করল এবং ম্যানেজমেন্টের কাছে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাল।

রাজনাদগাঁওস্থিত টেক্সটাইল মিল-এও ইউনিয়ন ওখানকার বিশেষ পরিস্থিতিগুলি নিয়ে দীর্ঘ আন্দোলন চালায়।

এখন দল্লী-রাজহরার খনিতে, খনির সড়কগুলিতে ম্যানেজমেন্ট জল ছিটিয়ে ধুলো ওড়া কম করে। খনির ধ্বনি প্রদূষণের বিরুদ্ধেও ইউনিয়ন দাবি জানায়। ইউনিয়নের চাপে ম্যানেজমেন্ট ই এন টি বিশেষজ্ঞ দ্বারা ধ্বনি প্রদূষণে আক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়।

১১. এদের রোখা কঠিন তো বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়

এক ছিল রাজা। রাজা মন্ত্রীর ভ্রষ্টাচারে খুব বিরক্ত হয়ে তাকে সমুদ্রের ধারে বদলী করলেন আর ভাবলেন এবার আর মন্ত্রী দুর্নীতি চালাতে পারবে না। মন্ত্রী সমুদ্রের ধারে ঢেউ গোনার কাজ নিলেন। পাশ দিয়ে যে সব জাহাজ যেত তাদের কাছ থেকে তিনি জরিমানা আদায় করা শুরু করলেন, কেন না তারা ঢেউ গোনার কাজে বাধা দিচ্ছে। এভাবে ঢেউ গুনেই তিনি ধনবান হয়ে গেলেন।

আমাদের দেশে ঢেউ-গোনা অফিসার-আমলা সংখ্যায় অনেক। পরিবেশ সুরক্ষার নামে ঢেউ গোনা চলে। বড় বড় শিল্প উদ্যোগ (যেমন কিনা ভিলাই ইস্পাত কারখানা) নিজেদের পরিবেশ বিভাগ বানিয়েছে। যে সব অফিসার কোনো কাজেই খুব একটা সুবিধের নয়, তাদের এ বিভাগে পুনর্বাসিত করা হয়।

কোনো জায়গায় বৃক্ষরোপণের জন্য ঠিকা দেওয়া হয়। গাছের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো হয়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পরের বছরই অধিকাংশ গাছ মরে যায়। ইউনিয়ন এ ধরনের কাজের বিরোধিতা করে এসেছে।

সিমপ্লেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, বি কে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ভিলাই-এর বড় বড় শিল্পপতি পরিবেশ রক্ষার নামে বৃক্ষরোপণের জন্য সরকারি জমি ঘিরে দেয়, আর কিছুদিন পরে সরকারি জমিতে কারখানার স্টক ইয়ার্ড বা ডাম্প ইয়ার্ড তৈরি হয়ে যায়। একদিন বৃক্ষরোপণ ঘোষণাকারী বোর্ডও ভেঙে যায়; সরকারি জমি কারখানার জমি হয়ে যায়। ইউনিয়ন এ ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধেও আন্দোলন জারি রেখেছে।

তিন-চার বছর আগে ভিলাই ইস্পাত কারখানার ম্যানেজমেন্ট দল্লীস্থিত ময়ূরপানী পাহাড়ে প্রথাগত ম্যানুয়াল খনি বন্ধ করে মেকানাইজ্‌ড খনি শুরু করার জোগাড়-যন্ত্র করতে থাকে, কারণ হিসাবে পরিবেশ সুরক্ষার যুক্তি দেখায়। ইউনিয়ন প্রশ্ন করে, যেখানে টপ-সয়েল (top soil) নেই, হাজার বছরেও সেখানে টপ-সয়েল তৈরি হবে না, সেখানে কিভাবে বৃক্ষরোপণ সফল হতে পারে। ইউনিয়নের যুক্তির সামনে ম্যানেজমেন্ট হার মানে। দানীটোলা কোয়ার্জাইট খনিতেও ম্যানেজমেন্ট একই ধরনের প্রয়াস চালালে ইউনিয়ন বিরোধিতা করে। একই যুক্তি হাজির করে, রাজনাদগাঁও জেলার চাঁদিডোঙরি খনি মালিক; ইউনিয়ন এখানেও বিরোধিতা করে।

আজকাল কোনো কোনো জায়গায় পরিবেশরক্ষার আড়ালে শিল্প-উদ্যোগ বিরোধী বিচার-ধারা দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের বিমূর্ত চিন্তা-ভাবনাকে ইউনিয়ন বিরোধিতা করে।

বাস্তব ব্যাপার হলো এই যে, আমাদেরকেই আমাদের নিজেদের প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে, নিজেদের ভূগোলকে রক্ষা করতে হবে। জঙ্গল, গাছ-পালা, নদীর স্বচ্ছ জল, শুদ্ধ হাওয়া, পশু-পাখি আর মানুষ সব মিলিয়েই তো আমাদের দুনিয়া। আমাদের সংবেদনশীলতার সঙ্গে এক নমনীয় কার্যক্রমকে ভিত্তি করে প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, আর এ কাজ জনচেতনার বিকাশের মধ্যে দিয়েই করা যাবে।

ছোটো ছোটো কথা, হাজারো দুঃখ গাথা
সহজেই বোঝা যায়,
কোথাও এক দুটি চেনা দাগ,
ধুলিকণা, একটি গাছকে কাটা,
কোথায় উনুনের ধোঁয়া।
লজ্জায় মুখ লুকোই
মেশিনের বাজারে।
কেবল বেদনা, দুখ গাথা
এই কি চলবে অনন্তকাল?
কিংবা
আমরা উঠে দাঁড়াব
অন্তিম ক্ষণে, শেষ হবে না
যেখানে শেষ হওয়ার ছিল
সেখানে জেগে উঠবে শুরুর সকাল।

উৎস মানুষ অক্টোবর - নভেম্বর, ১৯৯১ থেকে পুনর্মুদ্রিত

প্রেমানন্দ নেই, গুরু-বাবারা এবার নিশ্চিন্ত!

ভবানীপ্রসাদ সাহু

গত ৪ঠা অক্টোবর, ২০০৯ বেলা ২-২০ মিনিটে তামিলনাড়ুর পোদান্ধরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বি প্রেমানন্দ — বাসব প্রেমানন্দ। এর প্রায় একবছর আগে ২০০৮-এর ১৭ই নভেম্বর ভারতের পূর্বপ্রান্তে আমরা হারিয়েছিলাম গণবিজ্ঞান আন্দোলন ও বিজ্ঞানচেতনা প্রতিষ্ঠার এক অনন্য সৈনিক, 'উৎস মানুষ' পত্রিকার অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এখন দেশের দক্ষিণপ্রান্তে হারালাম ভারতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের এক পথিকৃৎ, 'ইন্ডিয়ান স্কেপটিক' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বাসব প্রেমানন্দকে, যিনি সারা ভারতে পরিচিত ছিলেন বি প্রেমানন্দ বা শুধু প্রেমানন্দ নামে।

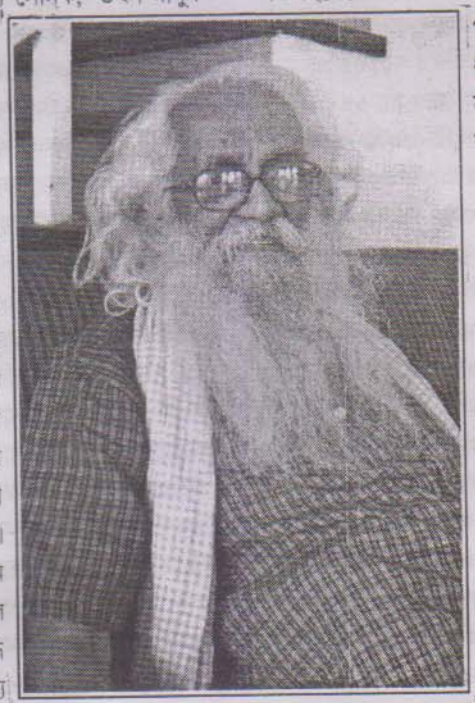

প্রেমানন্দ জন্মেছিলেন ১৯৩০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি কেরলের কোঝিকোড়ে। বিরাট ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন না। তবে তাঁর বাবা-মা অন্যান্য সাধারণ ছাপোষা মানুষের মতোও ছিলেন না। সামাজিক নানা কাজকর্ম ও আন্দোলনে যুক্ত থাকতেন। বিশেষ করে তাঁরা যুক্ত ছিলেন ঈশ্বরবাদী আন্দোলন (থিওসফিক্যাল মুভমেন্ট)-এর সঙ্গে যার বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে প্রেমানন্দের ছিল আমৃত্যু লড়াই। এই দিব্যজ্ঞান বা ঈশ্বরবাদ (থিওসফি)-র আন্দোলনের সঙ্গে অলৌকিক বুজরুকি ও ঈশ্বর-প্রেতাত্মা ইত্যাদি সম্পর্কিত বদ্ধমূল বিশ্বাস আর কুসংস্কার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। ১৮৭৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের হেনরি স্টিল অলকট-এর সভাপতিত্বে এবং রাশিয়ার ইউক্রেনের হেলেনা পাট্রভনা ব্লাভাৎস্কি (১৮৩১-১৮৯১)-র সক্রিয় উদ্যোগে থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের নানা লোককথা ও ধর্মপুস্তক ঘেঁটে জ্যোতিষবিদ্যা-প্রেততত্ত্ব-ঐশ্বরিক শক্তি-সংখ্যাবিদ্যা ইত্যাদি নানা ধরনের অপবিদ্যার সংমিশ্রণে এই সংস্থার তাত্ত্বিক ও প্রকাশ্য ক্রিয়াকাণ্ডের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আসলে এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের বড় অংশই ছিল সরলবিশ্বাসী মানুষকে বিভ্রান্ত ও প্রভাবিত করার জন্য প্রেতাত্মা ও ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটানো, যা করা হত নিপুণ চালাকি ও ম্যাজিক জাতীয় কাজ কারবার দিয়ে। প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার থেকে শুরু করে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার আবেগ — নানা কারণে এই সংস্থার কাজকর্ম বিরাট একটি আন্দোলনের আকারে আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ভারত, শ্রীলঙ্কা সহ নানা দেশে বিস্তৃত হয়। সঙ্গে শর্ত হিসেবে কাজ করেছিল তৎকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা অক্টাভিয়ান হিউম বা তার সভানেত্রী অ্যানি বেসান্তের মতো ব্যক্তিরাও তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যাই হোক ব্লাভাৎস্কির নানা অলৌকিক বুজরুকি ক্রমশ ধরা পড়ে যায় যদিও ভারতের 'হিন্দু থিওসফিক্যাল সোসাইটি'-র কাজকর্ম চলতেই থাকে। প্রেমানন্দ প্রসঙ্গে এই সংস্থার আরো বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার সুযোগ এখানে নেই তবু এই সামান্য আলোচনা করারও প্রয়োজন হত না যদি না প্রেমানন্দের মত ব্যক্তির বাবা-মা তার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকতেন।

প্রেমানন্দ নিঃসন্দেহে পরিবারের এই ধরনের পরিবেশের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এবং যথাসম্ভব এই প্রভাবের কারণেই শৈশব থেকে তিনি সাধুসন্তের 'অলৌকিক' কাজকর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। দিনের পর দিন তাদের পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছেন অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের আশায়। কিন্তু ঘোরাই সার হয়েছে। এমন কাউকেই পাননি যে অলৌকিক ক্ষমতার সত্যিকারের প্রমাণ দিতে পারে। ফলে অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করা প্রেমানন্দের আর হয়ে ওঠে নি। বরং হয়ে উঠেছিলেন ঘোর অবিশ্বাসী, এসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।

বিদ্রোহী তিনি ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। স্কুলপড়ুয়া বেশির ভাগ ছাত্রের মত ছিলেন না। স্কুলে পড়তে পড়তেই ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং স্কুল ত্যাগ করেন। প্রথাগত শিক্ষায় ঐখানেই ইতি। পরবর্তী প্রায় সাত বছর তিনি পড়াশোনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও মহাত্মা গান্ধীর ওয়ার্ধার ধাঁচে গড়ে ওঠা শ্রী-

স্টিলা গুরুকুল (Sri-Steila Gurukula)-এ। পরবর্তী জীবনেও অর্থের নেশায় তিনি ছুটে বেড়ান নি। বরাবরই সহজসরল জীবন কাটিয়েছেন। ছোটখাটো ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর আসল 'পেশা' হয়ে উঠেছিল যুক্তিবাদী ক্রিয়াকর্ম। ১৯৬৯ সালে প্রেমানন্দের সঙ্গে আলাপ হয় ভারতীয় উপমহাদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের আরেক পথিকৃৎ ডঃ আব্রাহাম থোম্মা কোভুর (১৮৯৮-১৯৭৮)-এর সঙ্গে। তাঁর অনুসন্ধিৎসু ও যুক্তিবাদী মানসিকতা একটি সুনির্দিষ্ট গতিমুখ পায় সম্ভবত ডঃ কোভুরের সঙ্গে এই যোগাযোগের মাধ্যমেই। তিনি অলৌকিকতা বিরোধী যুক্তিবাদী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হন এবং নিজের সমস্ত উদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এই কাজেই একটি বিশেষ মাত্রা যোগ হয় ১৯৭৫ সালে যখন থেকে তিনি তথাকথিত নানা সাধুজি-গুরুজি-বাবাজিদের বিশেষত সত্য সাঁই বাবা-র যাবতীয় অলৌকিক ক্ষমতার ও ঈশ্বরত্বের দাবির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লেখালেখি ও অনুষ্ঠানাদি শুরু করেন। সাঁইবাবার ছবি থেকে ছাই ঝরে পড়া বা শূন্যে হাত নেড়ে সন্দেশ - সোনার আংটি ইত্যাদির 'আবির্ভাব ঘটানোর মত তথাকথিত অলৌকিক কাজকারবারের পেছনের ফাঁকি ও জাদুকরসুলভ হাত সাফাইয়ের ব্যাপারগুলি প্রেমানন্দ হাতে কলমে করে দেখাতে থাকেন দক্ষ জাদুকরের মতই। শুধু নিজে দেখানো নয়, তিনি অন্যান্য বহুজনকে তা শেখাতেও শুরু করেন যাতে ব্যাপারটি তৃণমূলস্তরে বিস্তার লাভ করে।

এখন থেকে প্রায় ৩৫-৪০ বছর আগে 'ঈশ্বরের' সমাসনে আসীন সাঁইবাবার মত সফল ধর্ম ব্যবসায়ী ও বিখ্যাত মানুষের বিরুদ্ধে এ ধরনের কাজকর্ম ছিল অত্যন্ত সাহসের ও দৃঢ়চিত্তের পরিচয়। ভক্তবৃন্দের ও প্রাতিষ্ঠানিকতার সমস্ত বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে প্রেমানন্দ নিরলসভাবে এই ধরনের কর্মসূচি নিতে থাকেন। অচিরে তা এ দেশে ও বিদেশেও জনপ্রিয় হয় এবং মর্যাদা অর্জন করে। এর পরিচয় পাওয়া যায় ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (BBC)-এর পক্ষ থেকে তাঁকে ভারতের নেতৃস্থানীয় গুরুবাদধ্বংসকারী ব্যক্তিত্ব (India's Leading gun-buster) হিসেবে অভিহিত করার মধ্য দিয়ে এবং ইংল্যান্ডের চলচ্চিত্র নির্মাতা রবার্ট ইগল-এর করা প্রেমানন্দের উপর তথ্যচিত্র নির্মাণ করার মধ্যে। এই তথ্যচিত্রে শূন্যে ভাসা, জিভে ত্রিশূল ফোঁড়া, আগুনে হাঁটা, জীবন্ত সমাধি, শূন্যে হাত নেড়ে রসগোল্লা বা আংটি নিয়ে আসা ইত্যাদির মত তথাকথিত নানা অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক কাজকর্মের পেছনে কি কারসাজি রয়েছে তার ব্যাখ্যা এবং হাতে কলমে করে দেখানোর কাজ করেন প্রেমানন্দ। পরবর্তীকালে ভারত সরকারের 'ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কমিউনিকেশন'-এর পক্ষ থেকে জনমানসে বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য প্রেমানন্দকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়।

আগেই বলা হয়েছে ১৯৭৫ সাল থেকে প্রেমানন্দ গুরুজি-বাবাজিদের অলৌকিক ঐশ্বরিক ক্ষমতার দাবির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ১৯৭৬ সাল থেকে তা বিশেষত কেন্দ্রীভূত হয় সাঁইবাবার উপর। বছরের পর বছর চলতে থাকে এ লড়াই। এটিই একটি চূড়ান্ত মাত্রা পায় ১৯৮৬ সালে যখন প্রেমানন্দ প্রায় ৫০০ জন স্বেচ্ছাসেবী যুক্তিবাদী সদস্যদের নিয়ে সাঁইবাবার আস্তানা পুত্তাপার্থির দিকে পদযাত্রা শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে তাঁকে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তারবরণ করতে হয়। শূন্যে হাত নেড়ে সোনার আংটি ইত্যাদির 'আবির্ভাব' ঘটিয়ে সাঁইবাবা যেভাবে তাঁর সুনীল গাভাসকার-এর মত ভক্তদের উপহার দেন তার জন্য ঐ বছরই প্রেমানন্দ সাঁইবাবার বিরুদ্ধে দেশের স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী মামলা করেন। স্থানীয় আদালত তাঁর এই মামলা অবশ্য খারিজ করে দেয়। তবে প্রেমানন্দ তাঁর সেই বিখ্যাত যুক্তিটি এই প্রসঙ্গে উপস্থাপনা করেন যে — আধ্যাত্মিকতা কোন আইনস্বীকৃত অজুহাত নয় ('Spiritual power is not a defence recognised by law')। একই সঙ্গে তিনি 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রিমেডিজ অ্যাক্ট'-এর প্রসঙ্গও তুলেছিলেন।

অলৌকিক বুজরুকির বিরুদ্ধে প্রেমানন্দের এই আপাতব্যর্থ আইনি লড়াই কিন্তু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত এই রাষ্ট্রব্যবস্থা ঐ ধরনের প্রতারক গুরুজি-বাবাজিদের নগ্নভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলে, রাষ্ট্রের নিজস্ব জনমুখী আইনকেও তার জন্য কীভাবে সিংহচর্মাবৃত গর্দভে পরিণত করা হয়। কিন্তু এগুলি প্রেমানন্দকে দমাতে পারে নি। তিনি তাঁর কাজ পূর্ণ উদ্যমে করে গেছেন। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও বিজ্ঞানচেতনা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৮২ সালে 'মহারাষ্ট্র লোক বিজ্ঞান' আয়োজিত 'বিজ্ঞান যাত্রা'-য় এবং ১৯৮৭-এর 'ভারত জন বিজ্ঞান জাঠা'-য় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভারতের নানা প্রান্তে তিনি ছুটে গেছেন। ঐ সময় তিনি পশ্চিমবঙ্গেও এসেছিলেন এবং বেশ কয়েকটি জেলায় তাঁর অনুষ্ঠান করেন ও বক্তব্য রাখেন। এই সব অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগম থেকে ঐ সময় বিজ্ঞানচেতনা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বোঝা যায় এ ব্যাপারে প্রেমানন্দের প্রায় পেশাদারি দক্ষতা।

তথাকথিত অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা ও দাবির বিরুদ্ধে অন্যতম যে আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করে সেটি হল 'কমিটি ফর সাইন্টিফিক ইনভেস্টিগেশন অব্ ক্লেমস অব্ দ্য প্যারানর্মাল' (CSICOP)। এর নাম থেকেই স্পট বোঝা যায় এটি এই ধরনের ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজ করে। আহ্বায়ক হিসেবে প্রেমানন্দ তার ভারতীয় 'শাখা' (Indian

CSICOP) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৮৮ সাল থেকে তার মুখপত্র হিসেবে মাসিক 'ইন্ডিয়ান স্কেপটিক' পত্রিকা আমৃত্যু নিয়মিত প্রকাশ করে এসেছেন।

"১। বিজ্ঞানচেতনা মানবতা অনুসন্ধানী মানসিকতা ও সংস্কারের বিকাশ ঘটানো।

২। দায়িত্বশীল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অতিপ্রাকৃতিক ও অপবৈজ্ঞানিক দাবীসমূহের যথার্থ অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করা এবং তার ফলাফল বিজ্ঞানী সমাজ ও জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।"

এবং জানানো হয় এটি একটি 'অলাভজনক, বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষামূলক সংগঠন'। 'ইন্ডিয়ান স্কেপটিক' ছিল এর পত্রিকা এবং প্রেমানন্দ ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক মুদ্রক প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী। মুম্বাই-এর রাহুল সিং বা নাগপুরের শ্রীমতী মার্গারেট ভাট্টি-র মত কয়েকজন এর সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন এবং নতুন দিল্লির কে এন বালগোপাল ছিলেন এর আইনি উপদেষ্টা। দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে, প্রায় বিজ্ঞাপনবিহীন, ৪৮ পৃষ্ঠার (তিন ফর্মা) এই ইংরেজি পত্রিকা ছোট অক্ষরে সাধারণ কাগজে দেশ-বিদেশের প্রাসঙ্গিক খবর ও লেখাপত্রে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়ে এসেছে। তামিলনাড়ুর পোদানুর-এ ছিল এর কার্যালয়।

এই পত্রিকাকে হাতিয়ার করে প্রেমানন্দ অলৌকিকতা ও অবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই চালিয়ে গেছেন। সাঁইবাবা-র মত বিপুল ভক্ত-সমৃদ্ধ ধর্মীয় প্রতারকরা শুধু নয় বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু খ্যাত-অখ্যাত যারাই অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক অবৈজ্ঞানিক কাজকারবারের পৃষ্ঠপোষকতা করে তারাই তাঁর লেখায় আক্রান্ত হয়েছে, প্রেমানন্দ উন্মোচন করেছেন তাদের মুখোশ। তাঁর নানা অনুষ্ঠান বক্তব্য ও লেখাপত্রে এ ক্ষেত্রে তাঁর আপসহীন ও অত্যন্ত সাহসী মানসিকতার পরিচয় প্রতি ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। তাঁর লেখাপত্র থেকে এ ব্যাপারে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলে ইন্ডিয়ান স্কেপটিক-এর নভেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যার সম্পাদকীয়ের একটি অংশ এখানে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছিলেন : —

'দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শঙ্করদয়াল শর্মা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাও-কে রাজীব ফাউন্ডেশন থেকে অপসারিত করার জন্য আমরা রাজীব ফাউন্ডেশনকে অভিনন্দন জানাই। যে দেশে সরকারই জনগণের অর্থ লুঠ করে, সেই ভারতের এই অন্ধকার সময়ে এটি কিছুটা আলোর দিশা দেখাচ্ছে।

কৃষ্ণকান্ত ও সাঁইবাবা — কিন্তু এ আলো আবার আঁধারে ঢেকে গেল যখন আমরা দেখলাম সাঁইবাবার এক সাকরেদ (কৃষ্ণকান্ত)-কে দেশের উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হল। নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম যে কাজটি তিনি করলেন তা হল পুত্তপার্থি ছুটে গিয়ে সাঁইবাবার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন; কিন্তু না, ভারতীয় জনগণের কাছে গেলেন না।

এন টি রামা রাও-এর বিধবা পত্নী সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল হিসেবে কৃষ্ণকান্ত এন টি আর-কে ক্ষমতাচ্যুত করতে 'ব্রুটাস'-এর ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সাঁইবাবা-র শোওয়ার ঘরে ছ'টি খুনের মামলার ফাইল গোপন সরকারি আদেশে বন্ধ করার জন্য চন্দ্রবাবু নাইডু-কে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দিয়েছেন।'

সাঁইবাবার শয়ন গৃহে ছ' ছ'টি খুন হয়েছে বলে বা তার হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার আড়ালে কিডনি পাচার হয় — এমন সব চাঞ্চল্যকর অভিযোগও তিনি করেছেন।

পূর্বোক্ত সংগঠনটি ছাড়া প্রেমানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ফেডারেশন অব্ ইন্ডিয়ান র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনস' (FIRA)— এ দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা যুক্তিবাদী সংস্থাগুলির একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ। শেষ জীবনে প্রেমানন্দ ছিলেন এই সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা এবং তার পক্ষ থেকেও দেশের নানা প্রান্তে অনুষ্ঠানাদি করেছেন অসংখ্য বিদ্যালয়ে কর্মশালা পরিচালনা করেছেন।

'ইন্ডিয়ান স্কেপটিক'-এ বা অন্যত্র নানা লেখার পাশাপাশি পুস্তকাকারেও তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজিতে লেখা তাঁর কিছু বই বা পুস্তিকাগুলি হল— (১) সায়েন্স ভার্সাস মিরাক্‌ল্‌স্ (২) লিওর অব্ মিরাক্‌ল্‌স্, (৩) ডিভাইন অক্টোপাস, (৪) দ্য স্টর্ম অব্ গডমেন, গড অ্যান্ড জায়মন্ড স্মাগলিং (৫) সত্যসাই গ্রীড (৬) সত্য সাইবাবা অ্যান্ড গোল্ড কন্ট্রোল অ্যাক্ট, (৭) সত্য সাইবাবা অ্যান্ড কেরালা ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট (৮) ইভেস্টিগেট বালযোগী (৯) ইউনাইটেড ফ্রন্ট — ফিরা সেকেন্ড ন্যাশনাল কনফারেন্স উল্লেখ্য ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৯ চেন্নাইতে ফিরা-র ৭ম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে — এই প্রথম প্রেমানন্দকে ছাড়া। (১০) মার্ডারস ইন সাইবাবা'জ বেডরুম, (১১) এ টি কোভুর অক্টোজেনারি স্যুভেনির।

এছাড়া মালয়ালম ভাষাতেও তাঁর কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। (১) সাইবাবাইদে কলিকাল — এটি জনসন আইরুর ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন (২) সাইদাসিকাল দেবদাসিকাল (৩) পিনথিরি প্লানমারুদে মাস্টারপ্ল্যান।

নিজে বই লেখাপত্র ছাড়া তিনি প্রাসঙ্গিক বইপত্র নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'স্কেপটিক বুক ক্লাব'। স্থানীয় এলাকায় তো বটেই বিদেশেও সমমনস্ক ব্যক্তিদের কাছে এটি একসময় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

১৯৬৩ সালে ডঃ কোভুর তাঁর সেই বিখ্যাত চ্যালেঞ্জটি রাখেন এবং কোনরকম চালাকির সুযোগ না নিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কেউ যদি জ্যোতিষবিদ্যা-হস্তরেখাবিদ্যার

যাথার্থ্য সহ কোন অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারে তাকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৭৮ সালে কোভুর মারা যাওয়ার পর প্রেমানন্দ ঐ চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কারের ব্যাপারটি বলবৎ রাখেন। স্বাভাবিকভাবেই কোভুরের সময়ও যেমন তেমনি প্রেমানন্দের জীবদ্দশাতেই এই চ্যালেঞ্জ কেউ জিততে পারে নি, পুরস্কারের অর্থও কেউ পাওয়ার যোগ্য বলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারে নি। দু'চারজন কেউ কেউ এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে — ঐ ধরনের ক্ষমতার যথার্থ প্রমাণ কেউ দিতে পারে নি, তার সহজ কারণ ঐ ধরনের অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা বলে কিছু নেই, ঐ ধরনের ঘটনা বলে কিছু বলতে পারে না। কোভুর বা প্রেমানন্দের চ্যালেঞ্জ কেউ না জিততে পারলেও ঐ ধরনের ক্ষমতার অধিকারী বলে নিজেকে দাবি করার এবং তার মাধ্যমে অসংখ্য সরল বিশ্বাসী ভক্তদের প্রতারিত করার লোকের কিন্তু অভাব নেই। বিজ্ঞানমনস্কতাবিবর্জিত পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই এখনো ঐশ্বরিক অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন ও আত্মপ্রতারণা করেন।

প্রেমানন্দ আমৃত্যু এই অবিজ্ঞান ও প্রতারণার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন চেষ্টা করেছেন মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত ও বিজ্ঞানচেতনার আলোয় আলোকিত করতে উর্ধে তুলে ধরেছেন যুক্তিবাদ ও মানবতার পতাকাকে। তাঁর এই আন্তরিক ও নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাজন ও শ্রেণীবৈষম্য সম্পর্কিত সচেতনতার ঘাটতির দিকে কেউ কেউ অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। আশির দশকে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে যে সার্বিক গণবিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার একটি অবিচ্ছেদ্য ও মূল্যবান অঙ্গ প্রেমানন্দের মত ব্যক্তিদের যুক্তিবাদী আন্দোলন, মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করার আন্তরিক প্রয়াস; কিন্তু তবু এই যুক্তিবাদী ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে যান্ত্রিকতা, ব্যক্তিগতভাবে মূলত সাঁইবাবার বিরুদ্ধে উদ্যমের একটি বড় অংশ ব্যয় করা এবং গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সার্বিক চেতনার কিছু ঘাটতিও অনেকে অনুভব করেন। 'উৎস মানুষ' ছিল 'বিজ্ঞান সমাজ ও সংস্কৃতি'-র পত্রিকা; 'ইন্ডিয়ান স্কেপটিক' ছিল অতিপ্রাকৃতিক দাবির বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের জন্য গড়া সংস্থা (Indian CSICOP) -র পত্রিকা। উভয়ের এই গুণগত পার্থক্যও রয়েছে। কিন্তু এসব কোন কিছুই প্রেমানন্দের জীবনভোর ক্রিয়াকাণ্ডকে হতমান করে না। সাঁইবাবা তাঁর কাছে ছিল এই ধরনের গুরুজি-বাবাজি-স্বামীজি-অবতার বা পরমহংসদের প্রতীকী একটি চরিত্র — এইভাবেও ব্যাপারটিকে ধরা যায়। কুসংস্কার ও অলৌকিকতার বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিবাদী কাজকর্মে কোন ফাঁকি, চালাকি বা দ্বিচারিতাও কখনোই ছিল না। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও বা আরজ আলী মাতুব্বর-এর মত, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বা বাসব প্রেমানন্দের মত মানুষদের চিন্তা ও কাজ মানবতা ও বিজ্ঞানচেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানুষের স্বার্থে পরিচালিত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে আমাদের প্রেরণা জুগিয়ে চলবে দীর্ঘকাল।

তথ্যসূত্র :

প্রেমানন্দসম্পর্কিত তথ্যাদির জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

(১) U. Kalanathan (Kerala) National Secretary FIRA

(২) সায়ন্তী সাহু

(৩) দৈনিক স্টেটসম্যান ৫ই নভেম্বর ২০০৯

(৪) Indian Skeptic-এর বিভিন্ন সংখ্যা

লড়াকু বন্ধু আর নেই!

পূরবী ঘোষ

অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহের কোনো একটা দিন জাগুলি থেকে নিরঞ্জনদা ফোন করে জানালেন — 'প্রেমানন্দ নামের এক নিরীশ্বরবাদী মানুষ বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে তামিলনাড়ুর কোনো একটা হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এবং তাঁর শরীরে নানা রোগের উপসর্গ দেখা দেওয়ায় তিনি গুরুতর অসুস্থ।

তাঁর এই অসুস্থতার সুযোগে বিজ্ঞানবিরোধী একদল মানুষ প্রচার করে চলেছে শেষ পর্যন্ত প্রেমানন্দ ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে গেছেন। প্রেমানন্দের অনুগামীরা হাসপাতালে ওঁর কাছে সেই খবর পৌঁছে দেন। দেওয়ার পরে প্রেমানন্দ লিখিতভাবে জানান যে তিনি এখনও নিরীশ্বরবাদীই আছেন এবং শেষদিন পর্যন্ত তাই থাকবেন।

নিরঞ্জনদার দেওয়া খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখের সামনে ভেসে উঠল ছিপছিপে চেহারা একমাথা কোঁচকানো পাকাচুল আর লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা মানুষটির ছবি।

৮০-র দশকে গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে তখন বিজ্ঞান আন্দোলনের জোয়ার। সমস্ত রকম অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারমূলক কাজকর্ম করতে এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের একঝাঁক ছেলেমেয়ে। জায়গায় জায়গায় গড়ে উঠেছে গণবিজ্ঞান ক্লাব। এ বিষয়ে 'উৎস মানুষ'-এর ভূমিকা

ছিল সর্বাধিক। মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল 'উৎস মানুষ'। আর 'উৎস মানুষ'কে সামনে রেখে এই ছেলেমেয়ের দল শুরু করেছিল নানা অনুসন্ধান ও প্রচারমূলক কাজ।

এই রকমই অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী প্রচার ও পাশাপাশি বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা মূলক এক কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে শুরু হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায় পদযাত্রা। সঠিক সাল তারিখটা স্মৃতির ভাঁড়ার ঘেঁটেও পাচ্ছি না তবে নিশ্চিতভাবে ৮২/৮৩ সালের কোনো একটা সময়ে আমরা একদল ছেলেমেয়ে বর্ধমানে গেলাম ৭ দিনের বিজ্ঞান পদযাত্রায়। সকলের নাম আজ আর মনে নেই তবে মনে আছে বিলু, শিবু, প্রভাস, বাসু, গৌরী, তপন, শ্রীহর্ষ এদের কথা।

সবাই মিলে হৈ হৈ করে বর্ধমানে পৌঁছলাম। সেই সময়েই পরিচয় হয় বি প্রেমানন্দ ও তাঁর সঙ্গী আরুস্বামী-র সঙ্গে। প্যান্ট আর পাঞ্জাবি পরা ধবধবে সাদা চুল ও দাড়িওয়ালা লম্বা ছিপছিপে, স্বল্পভাষী হাসি-খুশী মানুষটি প্রথম দর্শনেই আমাদের ভালোলাগা আদায় করে নিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আরও চারজন অতিথি। তাঁরা এসেছিলেন বাংলাদেশের গণস্বাস্থ্য সংগঠন থেকে ।

যাই হোক, সবাই মিলে হৈ হৈ করে বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে চলছিল অনুষ্ঠান। এই পদযাত্রায় অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন এই প্রেমানন্দ। কারণ তিনি দেখাচ্ছিলেন ম্যাজিক বা হাত সাফাইয়ের কায়দা-কৌশল। অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'অলৌকিক নয় লৌকিক'। অনুষ্ঠানটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল বিভিন্ন সাধু সন্তরা তাঁদের ভক্ত ও শিষ্যদের সামনে যে সব অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখিয়ে, ভক্তদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আদায় করেন এবং নিজেদের বাবার আসনে প্রতিষ্ঠা করেন সেই সব ক্রিয়াকাণ্ড আসলে কিছু হাত সাফাই ও ম্যাজিক। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এইগুলো দেখিয়েই ওরা মানুষের মনে ভক্তি ও বিশ্বাস তৈরি করেন।

এইভাবেই বেশ কয়েকদিন ধরে চলছিল এই প্রচার কর্মসূচি। তখনও পর্যন্ত প্রেমানন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব তৈরি হয়নি। দলের সঙ্গে থাকার ফলে অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে দলগতভাবেই বিভিন্ন আলাপ আলোচনা চলছিল।

এরই মধ্যে একদিন বর্ধমানেরই কোনো একটি গ্রামের (নামটা মনে পড়ছে না) ওলাইচণ্ডীতলায় 'অলৌকিক নয় লৌকিক' অনুষ্ঠানটি করার জন্য আমরা গিয়েছিলাম। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের প্রচারের ফলে আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য। অনুষ্ঠান আরম্ভের ঘোষিত সময় ছিল বিকেল ৫টা। এদিকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রেমানন্দকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল দুপুরে। ৫টা বেজে গেছে, প্রেমানন্দ তখনো এসে পৌঁছন নি। সুতরাং সামনে বসা ছোট ছেলেমেয়েরা প্রচণ্ড গোলমাল শুরু করেছে। বারবার মাইকে ঘোষণা সত্ত্বেও ছোটদের থামানো যাচ্ছে না। আমরা প্রেমানন্দের অপেক্ষাতে মঞ্চের পাশে ঘোরাফেরা করছি। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল উদ্যোক্তাদের দু-একজন ছোট ছোট লাঠি দিয়ে বাচ্চাদের মারের ভয় দেখিয়ে চুপ করাচ্ছে। ব্যাপারটা আমার একটুও ভাল লাগল না। আমি তাড়াতাড়ি মঞ্চে উঠে বাচ্চাদের চুপ করানোর জন্য আগুন আবিষ্কারের একটা গল্প বলেছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই বাচ্চারা গল্পটা শুনতে শুনতে একেবারে চুপ করে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে কখন প্রেমানন্দ এসে পৌঁছে গেছেন, আমি জানতে পারিনি। কিন্তু গল্প শেষ করে মঞ্চ থেকে নামতেই ভদ্রলোক দু-হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'বাঃ তুমি তো খুব ভাল গল্প বলতে পারো?' তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের শুরু। তারপর যে কদিন ছিলাম ওঁর কাছ থেকে বিভিন্ন হাতের কৌশল শিখেছি। প্রতিটি খেলা দেখানোর আগে কীভাবে খেলাটির পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করতে হবে তা শিখিয়েছেন। এইভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কেটেছে কয়েকটা দিন। তারপর আমরা কয়েকজন কলকাতায় ফিরে আসি বাকীরা সবাই ওঁর সঙ্গে থেকে পদযাত্রা শেষ করে। দেশে ফিরে গিয়েও প্রেমানন্দ দীর্ঘদিন চিঠিপত্রে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে উনি চিঠি লিখতেন। তারপর কখন এক সময়ে যেন চিঠির আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

নিরঞ্জনদার দেওয়া খবরের কয়েকদিন বাদে গত ৫ নভেম্বরের খবরের কাগজের মাধ্যমে জানলাম 'চলে গেলেন বি প্রেমানন্দ'। ভারতে বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রথম সারির সৈনিক বাসব প্রেমানন্দ সারা জীবন অবিজ্ঞান ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যুক্তি দিয়ে সঠিক বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অসুস্থ থাকাকালীনও লড়াই অব্যাহত রেখেছিলেন। অনিবার্য মৃত্যুই তাঁকে থামিয়েছে।

ডাঃ কোভুরের উত্তরসূরী বি প্রেমানন্দকে একজন কাছের বন্ধু হিসাবে কয়েকটা দিন পেয়েছিলাম। আজ তাঁর মৃত্যু সংবাদে সেই কয়েকদিনের স্মৃতি মনের গভীর থেকে সামনে চলে এসেছে। এই স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানপ্রেমী বন্ধুকে জানাই শ্রদ্ধা ও সম্মান।

কুষ্ঠ কি সারবে?

জয়ন্ত দাস

বছর দশেক আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি বহুল প্রচারিত ইংরাজি দৈনিকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্রোড়পত্রটি পড়তে পড়তে চমকে উঠতে হল। একজন ডাক্তার তাঁর সচিত্র 'সাক্ষাৎকার'-এ রোগীদের পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তারই একটি প্রশ্ন ছিল কুষ্ঠরোগ নিয়ে। এক রোগীর প্রশ্ন ছিল—'আমার কুষ্ঠরোগের জন্য চিকিৎসা করিয়েছি। ডাক্তাররা বলছেন রোগটা সেরে গেছে। কিন্তু আমার সাদাটে অসাড় দাগটা তো মেলাচ্ছে না!'।

ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, সংবাদপত্রের পাতায় এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত এবং আত্মবিশ্বাসী জবাব দিচ্ছেন—'কুষ্ঠরোগ চিকিৎসায় সেরে যায়। যথাযথ 'বহু ওষুধ চিকিৎসা' (মাল্টি ড্রাগ থেরাপি, সংক্ষেপে এম ডি টি) করলেই আপনার দাগ মিলিয়ে যাবে।'

সে কি কথা! আমি ততদিনে প্রায় বছর বারো কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা করেছি, এবং বহু রোগীকে ঐ এম ডি টি দিয়েছি। তাঁদের অনেকের শরীরেই দাগ বা অসাড় দাগ পুরো মিলিয়ে যায় নি। সুতরাং ই-মেলে চিঠি পাঠালাম দৈনিকের অফিসে জানালাম এম ডি টি-তে অনেক সময় দাগ মেলায় না। ব্যাখ্যা দিলাম। চিঠিটি প্রকাশিত হল না। দৈনিকের ঐ বিশেষ ক্রোড়পত্রটির সঙ্গে যুক্ত এক সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় ছিল, ফোন করলাম । দুদিন পরে সে জানালো, বিশেষজ্ঞ তথা 'এক্সপার্ট'-দের 'সাক্ষাৎকার'—তার বিরোধিতা করে চিঠি ছাপানো 'রীতিবিরুদ্ধ'। বুঝলাম এদেশে এক্সপার্টরা বেদ-গোত্রীয়, অপৌরুষেয় জ্ঞানের আধার। স্বস্তি পেলাম যে আমার নামে কেউ ঈশ্বরনিন্দা বা ব্লাসফেমির মামলা অনেনি!

অবশ্য আমাদের চালু সংস্কৃতিতে চিকিৎসা-ব্যাপারে সত্যি কথা বলার বিশেষ চল নেই, দায় তো নেই-ই। বছর আট-দশ আগে শহরে গ্রামে কুষ্ঠ নিয়ে যেসব স্বাস্থ্য শিক্ষামূলক সরকারি পোস্টার-ফেস্টুনগুলো জ্বলজ্বল করত সেগুলো অত্যন্ত সাহসী, কিন্তু ততটা সত্যি নয়। যেমন ধরুন—'কুষ্ঠ সংক্রামক রোগ নয়।' ভাবতে অবাক লাগে, এটা একটা সরকারি বিজ্ঞাপন! কুষ্ঠ একটি জীবাণুঘটিত রোগ। মানুষ বাদে অন্য কোনো প্রাণীর দেহ এই রোগের গুরুত্বপূর্ণ বাহন নয়। কুষ্ঠের জীবাণু একটি মানব শরীর থেকে আরেকটি মানব শরীরে যায় এবং এভাবেই রোগটা ছড়ায়। এমন একটা রোগকে 'সংক্রামক রোগ নয়' বলে দিলে রোগ-সংক্রমণবিদ্যার গোড়াতেই কুড়ুল মারা হয়।

কুষ্ঠরোগের অনেকগুলো ধরন আছে। কয়েকটায় রোগীর শরীরে জীবাণু এতই কম থাকে যে তার শরীর থেকে অন্য কারোও শরীরে জীবাণু যথেষ্ট সংখ্যায় গিয়ে রোগ বাধানোর সম্ভাবনা খুব কম। লক্ষ্য করুন, 'খুব কম' বলছি, সম্ভাবনা 'একেবারে নেই' তা বলা চালে না কিন্তু। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে কুষ্ঠরোগীদের অধিকাংশ এই 'প্রায় না-ছোঁয়াচে' ধরনের। তাঁদের সংস্পর্শে এলে অন্য লোকের কুষ্ঠ হবার সম্ভাবনা বাস্তবে নেই বললেই চলে।

কিন্তু তার মানে এই নয় কুষ্ঠ রোগটাই অসংক্রামক হয়ে গেল। আমাদের দেশে বাকি সব কুষ্ঠরোগীর দেহে জীবাণুর সংখ্যা বেশি এবং তারা সংক্রামক। আসল মজাটা হল, যে মানুষটিকে আপনি কুষ্ঠরোগী হিসেবে চেনেন, তার সংক্রামক হবার সম্ভাবনা খুব কম। কেন বলুন তো? যে রোগীকে আপনি রোগী হিসেবে চেনেন, তার রোগটা সনাক্ত হয়েছে এবং চিকিৎসাও হয়েছে কিছুদিন। এখন যে সব ওষুধ কুষ্ঠের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় সেগুলো খুব দ্রুত জীবাণু মারতে পারে, ফলে দিনকয়েক চিকিৎসার পরে এমনকি অতি-সংক্রামক রোগীর শরীরেও অল্প জীবাণুই জীবিত থাকে। ফলে, আপনার চেনা কুষ্ঠরোগী চিকিৎসার অধীন বা পুরো চিকিৎসিত, তা না হলে আপনি তাঁকে কুষ্ঠরোগী বলে জানতেই পারতেন না—অতএব তিনি (প্রায়) অসংক্রামক। উল্টোদিক থেকে দেখলে, যেসব মানুষকে আপনি কুষ্ঠরোগী বলে সন্দেহই করেননি কস্মিনকালে, তাঁদের মধ্যে সংক্রামক কুষ্ঠরোগী থাকতে পারেন এবং আপনার সংক্রমণ ঘটতে পারে তাঁর কাছ থেকেই।

সরকারি দপ্তর যদি পোস্টার-ফেস্টুনে কথাটা এইভাবে লিখতেন —যে কুষ্ঠরোগীকে আপনি চেনেন তাঁর থেকে আপনার সংক্রমণের ভয় নেই। তাহলে সেটা কাজেরও হত, ভুলও হত না। আর উপরি হিসাবে আমাদের, ডাক্তারদের কাছে যেসব একটু শিক্ষিত মানুষজন আসেন কুষ্ঠরোগী বা তাঁর পরিজন হিসেবে, তাঁদেরও ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে সুবিধা হত—'ছোঁয়াচ লাগল কী করে, সরকার তো বলছে ছোঁয়াচে নয়!' এ জাতীয় অবিশ্বাস-মেশানো প্রশ্নের মুখে পড়তে হত না।

বলেছ তুমি সেরেছি তাই

সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী—কুষ্ঠরোগ চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সেরে যায়—এটিও অর্ধসত্য বিশেষ। এই স্লোগান বহুদিন পোস্টারে-ব্যানারে শোভা পেয়েছে, অধুনা যে পাচ্ছে না সেটাও আবার

আরেক উদ্ভট মারপ্যাঁচ—সে কথায় যথাসময়ে আসা যাবে। কুষ্ঠরোগ 'সেরে যাওয়া' ব্যাপারটা কী? রোগীর চামড়ায় দাগ মিলিয়ে যায়? না, সবসময়ে যায় না। অসাড়ভাব মিলিয়ে যায়? না, প্রায়শই যায় না। অসাড় জায়গায় যে ঘা-গুলো হয় সেগুলো সেরে যায়? সবসময় তা-ও যায় না। তাহলে সরকারি চিকিৎসার এমডিটি-তে কুষ্ঠরোগীর সারে কোন জিনিসটা? তার শরীরের সমস্ত জীবাণু (আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, 'প্রায়' সমস্ত জীবাণু) মরে যায়। কুষ্ঠরোগীরা সকলেই মাইক্রোস্কোপে চোখ-রাখা জীবাণু-বিশারদ নন, তাঁরা ডাক্তারের কাছে আসেন তাঁদের শরীরে অসাড় ভাব, দাগ, ফোলা, ঘা—এই সব সমস্যা নিয়ে। সেগুলো না সারিয়ে যদি ডাক্তারবাবু (বা স্বাস্থ্যকর্মী) কোনো সময় ঘোষণা করে দেন, যান মশায়, আপনার রোগ সেরে গেছে, তবে রোগী সে কথায় খুব আস্থা রাখবেন এমন আশা করা যায় না। একদিকে সরকারি প্রচার-লিখন—'কুষ্ঠরোগ এম ডিটি চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সেরে যায়'—অন্যদিকে সরকারি-বেসরকারি ডাক্তারদের রোগীর লক্ষণ-উপসর্গ সব কিছুকে সারিয়ে না তুলেই 'সেরে গেছে' ঘোষণা, রোগী পড়েন দোটানায়। কেউ যান অন্য ডাক্তারের কাছে, কেউ বা এম ডিটি মার্কা চিকিৎসাতে আস্থা হারিয়ে ছোটেন কবিরাজ-হোমিওপ্যাথ-হাকিমের কাছে, কেউ শরণ নেন জলপড়া-টোটকা-গুনিনের।

একেই তো ডাক্তারবাবু যখন রোগীকে বলেন—আপনার কুষ্ঠ হয়েছে—রোগীর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হয়। রোগিনী হলে তাঁর সমস্যা আরো বেশি—সে কথায় পরে কোনোদিন আসা যাবে। তদুপরি এ রোগ নিয়ে ডাক্তার-সরকারি ভাষ্য—খবরের কাগজ থেকে পাড়ার পাঁচজন, সকলে এমন পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা বলতে থাকেন যে রোগীর পক্ষে মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যদি বা রোগী চিকিৎসা চালিয়ে যান তো তাঁর অবস্থা কী হয়?

ক্ষুদ্র জীবাণু বৃহৎ রোগ

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় কি ফল হতে পারে বা পারে না সেটা বুঝতে গেলে কতকগুলো গোড়ার কথা জানা দরকার। কুষ্ঠ একটি জীবাণুঘটিত রোগ। যে জীবাণু এ রোগ ঘটায় তাকে হ্যানসেন সাহেব সেই ১৮৭৩ সালেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাকে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। কুষ্ঠের প্রত্যক্ষ কারণ জীবাণু বটে, কিন্তু একথা সন্দেহাতীত ভাবে সত্যি যে দারিদ্র, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘেঁষাঘেষি করে থাকা ও সাধারণভাবে খারাপ স্বাস্থ্য থাকলে সেখানে কুষ্ঠ দ্রুত ছড়ায়। অপরপক্ষে, কুষ্ঠের জীবাণু মারার নির্দিষ্ট ওষুধ ছাড়াও যদি স্বাস্থ্য-পুষ্টি-পরিবেশের মান উন্নয়ন করা যায় তো এ রোগের বাড়বাড়ন্ত কমে যায় —যেমনটা ঘটেছে বিগত এক-দেড় শতাব্দী জুড়ে ইউরোপ-আমেরিকায়।

আগেই বলেছি, প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রজাতির দেহে কুষ্ঠের জীবাণু স্বাভাবিকভাবে বিচরণ করে না বললেই চলে। মানবদেহে এই জীবাণুর প্রধান বিচরণক্ষেত্র হল ত্বক ও স্নায়ু। রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় প্রধানত এই দুটিতেই। কুষ্ঠ সনাক্ত করতে গেলে সাধারণভাবে এই চারটির মধ্যে অন্তত দুটি থাকা দরকার—চামড়ায় দাগ, অসাড়তা, কোনও স্নায়ুর মোটা হয়ে যাওয়া ও চামড়া চিরে চাঁচা পরীক্ষায় (স্লিট স্কিন স্মিয়ার, সংক্ষেপে এস এস এস) কুষ্ঠের জীবাণু পাওয়া।

চামড়ায় জীবাণু সংক্রমণের ফলে চামড়ায় সাদাটে বা লালচে দাগ, গোটা, চামড়া ফুলে যাওয়া ইত্যাদি দেখা যায়। আর স্নায়ুতে সংক্রমণের ফলে দুরকম ক্ষতি হতে পারে। সেসব স্নায়ু তাপ, বেদনা, স্পর্শ ইত্যাদি অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয় সেইসব সংবেদী স্নায়ুতে রোগের আক্রমণের ফলে হাত-পা ও নানা জায়গা অসাড় হয়ে যায়, সেখানে রোগীর অজান্তে আঘাত লাগা বা পুড়ে যাবার ফলে ব্যথাহীন ক্ষত হয়, ব্যথা না থাকায় ক্ষতের যত্ন নেওয়া হয় না ও ক্ষত বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত হাত-পা অসাড় ও বিকৃত, আঙ্গুলগুলি ক্ষয়ে যাওয়া ও ঘা ভর্তি হয়ে উঠতে পারে। আবার যেসব স্নায়ু মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডের হুকুম অনুযায়ী আমাদের ছোটবড় মাংসপেশিগুলোকে নাড়ায়, সেগুলোকেও এই জীবাণু আক্রমণ করে। ফলে শরীরের ওপর, বিশেষ করে হাত-পায়ের ওপর রোগীর নিয়ন্ত্রণ কমতে থাকে। এর চরম অবস্থায় হাত দিয়ে একটা পেনসিল পর্যন্ত ধরার ক্ষমতা থাকে না, আর শুকিয়ে যাওয়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত মাংসপেশি অকর্মণ্য হাত-পায়ের দৃশ্যমান বিকৃতি আরো বাড়িয়ে তোলে। চোখের পাতা বন্ধ করার মাংসপেশি অকেজো হয়ে গেলে চোখটি পুরো বন্ধ করা যায় না, ফলে অনবরত ছোট ছোট ধূলিকণা ইত্যাদি চোখে পড়ে দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে। আবার চোখের ভেতরকার অসাড়তার জন্য রোগী এসব চোট-আঘাত বুঝতেই পারে না। এ-দুয়ের যোগফলে চোখের বিকৃতি ও আংশিক বা পূর্ণ অন্ধত্ব দেখা দেয়। এছাড়া মুখের মধ্যে দাঁত পড়ে যাওয়া, নাকের হাড় বসে যাওয়া, চামড়া ফুলে যাওয়া মুখটিকে বিকৃত করে দেয়। বলা প্রয়োজন কুষ্ঠরোগী মাত্রেই এতটা বিকৃতি ও অঙ্গহানি শিকার হন না। যেসব রোগীর দেহে জীবাণু সংখ্যা বেশি ও যাদের যথাসময়ে যথাযত চিকিৎসা হয় নি, তাদেরই এতটা ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

একই জীবাণু তবু বহুরূপী রোগ

কুষ্ঠরোগের জীবাণু মারার মতো চিকিৎসা আছে। যদি রোগী রোগের প্রথম অবস্থাতেই চিকিৎসা শুরু করে তবে তার অসাড়তা, হাত-পায়ের অকেজো হয়ে যাওয়া, মুখের বিকৃতি এসব কিছুই

না হতে পারে এবং রোগী পুরোপুরি সেরে উঠতে পারে। লক্ষ্য করুন, রোগের গোড়াতে চিকিৎসা করলেও রোগী পুরোপুরি 'সেরে উঠতে পারেন' বলছি, 'সারবেনই' এমনটা বলছি না। কেন তা ক্রমশ প্রকাশ্য।

চিকিৎসার খাতিরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কুষ্ঠরোগীদের দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন—বহু-জীবাণুধারী ও স্বল্প-জীবাণুধারী। বহুজীবাণুধারী রোগীদের চামড়া বা নাকের ভেতর থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে চিরে ও চেঁছে নিয়ে কাঁচের স্লাইডে সেই রস লাগিয়ে যথাযথ প্রক্রিয়ায় রং করে অণুবীক্ষণে দেখলে জীবাণু দেখা যাবে; অল্প-জীবাণুধারী কুষ্ঠরোগীদের দেহে এভাবে কুষ্ঠের জীবাণু খুঁজে পাওয়া যাবে না।

একই রোগে একই জীবাণু কারোর শরীরে কেন বেশি থাকে আবার অন্য কারোর শরীরে কেন কম সেটা বুঝে নেওয়া দরকার। বহুজীবাণুধারী কুষ্ঠে (মাল্টিব্যাসিলারি লেপ্রসি, সংক্ষেপে এম বি কুষ্ঠ) রোগীর দেহে জীবাণু সংখ্যা বেশি। এম বি কুষ্ঠরোগীও আবার সবাই একরকম নন। কারো দেহে একটি মাত্র চামড়া চাঁচা (এস এস এস) পরীক্ষায় হাজার হাজার জীবাণু পাওয়া যায়, আবার কারো শরীরে পাওয়া যায় কয়েকটি মাত্র। জীবাণু কম বেশি হবার কারণ শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা। যাঁদের শরীরে কুষ্ঠ-জীবাণু বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা খুব কম তাঁদের চামড়া চাঁচা পরীক্ষায় খুব বেশি সংখ্যায় জীবাণু পাওয়া যায়; যাদের এই প্রতিরোধক্ষমতা একটু বেশি তাঁদের কম পাওয়া যায়। আর যাঁদের এই প্রতিরোধক্ষমতা আরও বেশি তাঁদের শরীরে জীবাণু সংখ্যা এতই কম যে রোগ হলেও এই পরীক্ষায় জীবাণু ধরা পড়ে না—এঁদেরই আমরা বলি অল্প-জীবাণুধারী (প্যাব্সিব্যাসিলারি, সংক্ষেপে পি বি) কুষ্ঠরোগী। কিন্তু কাদের শরীরে কুষ্ঠের প্রতিরোধক্ষমতা সবচেয়ে বেশি বলুন তো? সেই সমস্ত মানুষের যাঁদের দেহে কুষ্ঠের জীবাণু ঢুকেছে, কিন্তু বাসা বাঁধতেই পারে নি—তাঁদের শরীরে রোগজীবাণু বা রোগলক্ষণ কিছুই নেই। আমরা যেসব ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা, তিরিশ বছরের বেশি সময় ধরে সংক্রামক কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শে আসছি অথচ শরীরে এ রোগের চিহ্ন নেই, তারা হলাম সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধীদের দলে। 'তিরিশ বছর' বললাম কেন? এজন্যই যে কুষ্ঠের জীবাণু দেহে ঢোকার কয়েকমাস থেকে তিরিশ বছর পরে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এর রোগলক্ষণ প্রথম দেখা দিতে পারে।

শত্রু মিত্র নাহি চিনি

কুষ্ঠরোগের প্রতিরোধক্ষমতা সেটা ভালা না মন্দ? এটা আবার একটা প্রশ্ন হল নাকি? কুষ্ঠের বিরুদ্ধে আমাদের শরীর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, সেটা মন্দ হতে যাবে কোন দুঃখে? কিন্তু মন্দ হয়। কিভাবে? অনেকটা সেই ফুটবল খেলার সেমসাইড গোলের মত—খেলোয়াড় বল মারতে চাইল বিপক্ষ দলের দিকে, অথচ বলটা পায়ে লেগে ঢুকে গেল নিজেদের গোলেই।

কুষ্ঠের জীবাণু মারার জন্য শরীর যা ব্যবস্থা নেয় তার সিংহভাগটাই কার্যকরী করে আমাদের রক্তে, লসিকায় ও অন্যত্র ছড়িয়ে থাকা একধরনের শ্বেত রক্তকনিকা—লিম্‌ফোসাইট। এরা যেসব ব্যবস্থা নেয় তাদের কয়েকটি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তার পুঙ্খানুপুঙ্খ জটিলতায় না গিয়ে এটুকু বলা যায় যে লিম্‌ফোসাইটের নেওয়া ক্ষতিকর ব্যবস্থার ফলে সময়ে সময়ে রোগীর চামড়া লাল হয়ে ফুলে যায়, নতু নতুন জায়গার চামড়ায় অসাড় দাগ দেখা দেয়, স্নায়ুগুলি আক্রান্ত হয়ে ব্যথা হয় ও স্নায়ু অকেজো হয়ে পড়ে।

কুষ্ঠের জীবাণু আমাদের শরীরে ঢুকে পড়ার পরে কিছু লিম্‌ফোসাইট এদের মারার চেষ্টা করে। সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হলে সমস্ত জীবাণু মারা পড়ে, শরীরে কোনো রোগলক্ষণ দেখা দেয় না ও ভবিষ্যতে কুষ্ঠের জীবাণু পুনরায় দেহে ঢুকলেও রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু লিম্‌ফোসাইটগুলি যদি এ কাজে একেবারে অসমর্থ হয় তবে দেহে ঢোকা অল্প কয়েকটি জীবাণু বংশবৃদ্ধি করে কোটি কোটি জীবাণু সৃষ্টি করে। আর লিম্‌ফোসাইটগুলি আধা-সমর্থ হলে শরীরে তুলনায় কম পরিমাণে জীবাণু তৈরি হয়। এখন, শরীরে জীবাণু থাকলেই তাদের মারার চেষ্টা করে অ্যান্টিবডি তৈরি হল এক ধরনের লিম্‌ফোসাইটের কাজ। শরীরে যত বেশি জীবাণু থাকবে তারা তত বেশি অ্যান্টিবডি তৈরি করবে। দুঃখের কথা হল কুষ্ঠরোগের জীবাণু এসব অ্যান্টিবডিতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। উপরন্তু এই অ্যান্টিবডির কার্যকলাপে শরীরের, বিশেষ করে স্নায়ুর খুবই ক্ষতি হতে পারে।

কুষ্ঠরোগের একটা দশাকে বলা হয় প্রতিক্রিয়ার দশা (রিঅ্যাকশনাল স্টেট)। এই প্রতিক্রিয়া ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া য়। কুষ্ঠরোগের জীবাণু বা সেই জীবাণুর দেহস্থিত অ্যান্টিজেন, এর বিরুদ্ধে লিম্‌ফোসাইটগুলোর অ্যান্টিবডি তৈরি নীরস পরিসংখ্যানের অবতারণা প্রয়োজন। পাঠক নেহাত বিরক্ত বোধ করলে এই অংশটা বাদ দিয়ে পড়তে পারেন, মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি বুঝতে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়।

১৯৯২ সালে সারা পৃথিবীতে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ছিল ৩১ লক্ষ সে সময়ে জনসংখ্যার মাপে প্রতি দশ হাজার মানুষ পিছু ৫.৭ জন কুষ্ঠরোগী। মানুষের সংখ্যা অবশ্যই ভগ্নাংশ হয় না, ৫.৭ জন মানুষ বা সাড়ে পাঁচজনের একটু বেশি সংখ্যক মানুষ—এটার কোনো অর্থ নেই। ওটা অঙ্কের কারিকুরি, বুঝতে অসুবিধা হলে ধরে নিন প্রতি এক লক্ষ মানুষে ৫৭ জন কুষ্ঠরোগী। সে সময়ে পৃথিবীর সমস্ত কুষ্ঠরোগীর শতকরা ৭০ ভাগের বাস ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, মূলত ভারতে। ১৯৯২ সালে ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতি দশ হাজার মানুষের

মধ্যে গড়ে ১৬.৩ জন পঞ্জিভুক্ত কুষ্ঠরোগী ছিলেন।

শুধুমাত্র ভারতের কথাই যদি বলি, ১৯৯৩ সালে মোট (পঞ্জিকৃত ও অপঞ্জিকৃত) রোগীর সংখ্যা ছিল মোটামুটি ১৩ লক্ষ, অর্থাৎ প্রতি দশহাজার ভারতীয়ের মধ্যে ২৪ জন কুষ্ঠরোগী। এমডিটি চালু থাকালীন ১৯৯৩ থেকে ২০০৪ এই ১১ বছরে রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়াল ২.৩ লাখ এবং ২০০৪ সালের হিসাবটা কেবলমাত্র পঞ্জিকৃত রোগীর হিসেব, অপঞ্জিকৃত রোগীর সংখ্যা ততটা পরিষ্কার নয়। তবু দশ হাজারে ২৪ জন (মোট) রোগী থেকে নেমে দশ হাজারে ২.৪ জন মাত্র (পঞ্জিকৃত) রোগী—অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ব্যাপার।

গণচিকিৎসার নবপর্যায়

এই সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন—২০০৫ সালের শেষ দিনটিতে ভারতে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা কমিয়ে দশ হাজারে মাত্র ১ জনে নামিয়ে আনা হবে। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হল আগেভাগে। 'দশ হাজারে একজন রোগী' এই পরিসংখ্যানটির বৈশিষ্ট্য কি? বৈশিষ্ট্য হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে এই সংখ্যায় নামলে কুষ্ঠ জনসমাজে সেভাবে ছড়ায় না। এখানে উল্লেখ্য যে সব বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত নন। 'দশ হাজারে একজন মাত্র' এই জাদু অনুপাতে পৌঁছে গেলেই এদেশে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার চালু পরিকাঠামোর খোলনলচে বদলে ফেলা হবে—এমন সিদ্ধান্তও সরকারি পর্যায়ে আগেভাগেই নেওয়া হয়ে গেল।

'দশহাজারে একজন' বা তার চেয়ে কম রোগী—এটার সরকারি অভিদা হল এলিমিনেশন লেভেল। এলিমিনেশন কথাটার বাংলা মানে দাঁড়ায় 'দূরীকরণ' বা 'অপনয়ন'। এখানে একটা কথার মারপ্যাঁচ লক্ষ্য করুন। রোগ নির্মূল করাকে বলে ইরাডিকেশন। নির্মূলীকরণের বদলে 'দূরীকরণ' বা 'অপনয়ন' বসানো অনেকটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো। রোগটা নির্মূল বা উচ্ছেদ করা গেছে এমন দাবি করা হল না, কিন্তু জনমানসে ঠিক সেই ধারণাটাই বিকল্প একটা শব্দ 'দূরীকরণ'-এর মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হল। 'জনমানসে' বলি কেন, আমি জানি ভারতে অনেক প্রথম শ্রেণীর মেডিক্যাল কলেজের চর্মরোগ ও কু,ঠরোগ বিভাগের অধ্যাপকরাও ধরে নিয়েছেন ও দুটো একই কথা, 'দশহাজারে একজন' মানে নির্মূলীকরণ (ইরাডিকেশন) (সূত্র : ব্যক্তিগত আলাপচারিতা ও ই-মেল)। 'জাতীয় কুষ্ঠ নির্মূলীকরণ প্রকল্প' (ন্যাশনাল লেপ্রসি ইরাডিকেশন প্রোগ্রামস বা এন-লেপ) তার নাম অপরিবর্তিত রেখেছে, সুতরাং এন-লেপ-এর আশু লক্ষ্য যে এলিমিনেশন নাকি ইরাডিকেশন তা নাম থেকেও বোঝা সম্ভব নয়।

পরিসংখ্যান বা ভোজবাজি আখ্যান

কিভাবে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে এই 'দশহাজারে এক' পরিসংখ্যানে পৌঁছনো গেল? আমরা আগেই দেখেছি ৩১ মার্চ ২০০৪-এ এদেশে পঞ্জিকৃত রোগীর সংখ্যা ছিল দশহাজারে ২.৪ জন। জনসংখ্যার অনুপাতে রোগীর সংখ্যা যত কমে ততই নতুন রোগী খুঁজে বের করা ও চিকিৎসা করা কঠিন হয়ে যায়—তাই ১৯৯৩ সালে যখন দশহাজার মানুষের মধ্যে ২৪ জন পঞ্জিকৃত রোগী ছিলেন তখন যত বেশি সহজে রোগী সনাক্ত করা যাচ্ছিল ২০০৪ সালে সে কাজটা তত সহজ রইল না। সুতরাং ২১ মাসে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা দশহাজারে ২.৪ জন থেকে নামিয়ে ১ জনে নামিয়ে আসা কাজটা অসম্ভব না হলেও কঠিন, ভয়ানক পরিশ্রমসাধ্য কাজ। কিন্তু আমরা এখনই দেখতে পাব, কঠিন বিকল্পের কোনও পরিশ্রম নেই!

ঐ ২১ মাসে চিকিৎসার ফলে 'জীবাণুমুক্ত' (তা বলে 'রোগমুক্ত' তা বলা যাচ্ছে না কিন্তু) কুষ্ঠরোগের সংখ্যা কমেছে, বেশ দ্রুতই কমেছে। কিন্তু তার সঙ্গে যেসব 'বিকল্প' পদ্ধতিতে রোগীর সংখ্যা কমিয়ে দেখানো হয়েছে তার কয়েকটির নমুনা দিচ্ছি।

(১) এন-লেপ-এ এক-একটি কার্যকর 'ইউনিট' তার অধীনস্থ এলাকার জনসংখ্যা বাড়িয়ে দেখাচ্ছে যাতে কুষ্ঠরোগীর তুলনামূলক সংখ্যা বা অনুপাত কমে যায়। এবং মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০ থেকে ২৫ শতাংশ নিয়ে সমীক্ষা করা হচ্ছে, তার সঠিক তথ্য সংরক্ষণ হচ্ছে না, নতুবা পঞ্জিকৃত রোগীর সংখ্যা আরো বেশি হত। এটা কিন্তু আমার কথা নয়, একথা বলছেন স্বয়ং চিফ্ অডিটর জেনারেল তাঁর রিপোর্টে ২২.১০.২০০২ তারিখের 'দ্য টেলিগ্রাফ' সংবাদপত্র দ্রষ্টব্য। তারিখটা খেয়াল করুন। কুষ্ঠ দূরীকরণের দিনক্ষণ তখনও নির্ধারিত হয়নি, কিন্তু তথ্যের কারচুপি শুরু হয়ে গেছে এবং পরে এ প্রবণতা কমেনি বরং বেড়েছে। এই তথ্য নিয়ে কারচুপির পেছনে যে গভীরতর অসুখ আছে, তার ইঙ্গিত আমরা পরে দিচ্ছি।

(২) চিফ অডিটর জেনারেল (সি এ জি) আরও বলেছেন যে রাজ্যে রাজ্যে ভারপ্রাপ্ত কুষ্ঠরোগ আধিকারিক ২০০০ সালের মে মাসে একটি নির্দেশনামা জারি করেছেন—যাঁদের রেশন কার্ড বা ভোটার কার্ড নেই তাঁদের মধ্যে কুষ্ঠরোগ থাকলে তাঁরা সরকারের মূল পরিসংখ্যানে ঠাঁই পাবেন না। মনে রাখবেন, হতদরিদ্র বাস্তুচ্যুত মানুষদের মধ্যে কুষ্ঠরোগের প্রকোপ বেশি।

(৩) সি এ জি তাঁর রিপোর্টে জানাচ্ছেন, অনেক ক্ষেত্রেই নির্ধারিত সময়ের পুরোটা জুড়ে ওষুধ সরবরাহ না করেই রোগীকে 'চিকিৎসা থেকে খালাস' ঘোষণা করে পরিসংখ্যান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

(৪) চামড়ায় একটিমাত্র দাগ আছে এমন কুষ্ঠরোগীকে এখন প্রায়শই নথিভুক্ত করা হচ্ছে না—কেন না কর্তাব্যক্তিরা মনে করছেন যেহেতু কুষ্ঠরোগ সনাক্তকরণের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী নেই তাই এসব ক্ষেত্রে কুষ্ঠ নয় এমন রোগী ভুল করে কুষ্ঠ হিসেবে সনাক্ত হতে পারেন। সুতরাং এরকম রোগীকে বাদ দেওয়া ভালো, মাথা না থাকলে তো 'রোগনির্ণয়ে ভুল' নামক মাথাব্যথাটি থাকে না। বোকারা অবশ্য বলতে পারে রোগীদের সনাক্তকরণ কাজটি অফিসিয়ালি বাদ দিয়ে যে কুষ্ঠরোগ নির্মূলীকরণ প্রকল্প চলে সে প্রকল্পটিই নির্মূল করা উচিত। নতুবা রোগী চিনতে পারেন এমন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ ও যথাযথ প্রশিক্ষণ-এর দ্বারা সমস্যাটির সমাধান কঠিন কিছু নয়।

(৫) এখন কুষ্ঠরোগের জন্য আগেকার মতো 'নির্দিষ্ট রোগকেন্দ্রিক' পরিকাঠামো ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। ফলে গ্রামে, বস্তিতে গিয়ে কুষ্ঠ আছে কিনা সেটা খোঁজার যেটুকু কাজ হত সেটা হচ্ছে না, পোস্টার-ব্যানার-বিজ্ঞাপনে রোগটি সম্পর্কে প্রচার চালানো প্রায় বন্ধ। রোগী নিজে থেকে কখন সরকারি ক্লিনিকে আসবে তার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। এতে নথিভুক্ত রোগীর সংখ্যা কমছে, অন্যদিকে রোগীরা রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্লিনিকে আসছেন না, আসছেন জটিলতা বৃদ্ধি পাবার পর। ফলে রোগীর অঙ্গ বিকৃতি বা অক্ষমতার সম্ভাবনা বাড়ছে, বাড়ছে একজন রোগী থেকে আরও পাঁচজনের রোগ হবার সম্ভাবনাও। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'গুডউইল অ্যাম্বাসাডর' আগস্ট ২০০৫-এ একটি নিউজলেটারে 'রোগ নথিভুক্তীকরণ কমানোর প্রবণতা'-কে একটি সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছেন।

(৬) একটিমাত্র দাগবিশিষ্ট কিছু রোগীকে তিনটি ওষুধ একসাথে দিয়ে মাত্র একদিনেই চিকিৎসা সম্পূর্ণ করা হচ্ছে—পরিভাষায় এর নাম 'রম' চিকিৎসা। এটা এমনিতে ভালো ব্যাপার। কিন্তু মুশকিল হল, এদের নাম নথিতে তুলে পরদিনই কেটে দেওয়া হচ্ছে; সুতরাং তারা মাস বা বছরওয়ারি রোগীর সংখ্যার হিসেবে আসছে না। অর্থাৎ পরিসংখ্যানের হিসেবে এদের অস্তিত্বই নেই।

(৭) সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা পাশাপশি প্রাইভেট চিকিৎসা ব্যবস্থা চলছে। যদি কোনও কুষ্ঠরোগী প্রইভেটে দেখান তো তাঁর নাম সরকারি নথিতে উঠছে না। কিছুদিন আগে যখন কুষ্ঠরোগের জন্য সরকারি হাসপাতালগুলোতে আলাদা পরিকাঠামো ও ব্যবস্থা ছিল তখন এরকম রোগীরা নিজের উদ্যোগে বা বেসরকারি ডাক্তারবাবুদের কথার অপেক্ষাকৃত সহজে সেই সরকারি ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন, তাঁদের নামও নথিভুক্ত হত, পরিসংখ্যানে যোগ হত। এখন এরকম রোগী যদি সরকারি হাসপাতালে আসেন, তাঁদের পক্ষে যথাযথ জায়গাতে গিয়ে পৌঁছনোই কঠিন, চিকিৎসা পাওয়া তো আরো দূরের ব্যাপার। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতে রয়েছে, সরকারি হাসপাতালে আমি কুষ্ঠরোগী পাঠিয়েছি, সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মী তাঁকে ফেরত পাঠিয়েছেন এই বলে যে—'আপনার তো খানিকটা চিকিৎসা প্রাইভেটে হয়েছে, এখন আপনার নাম আমাদের খাতায় ছোকানো যাবে না, কেন না খানিকটা চিকিৎসা পাওয়া রোগীদের নাম নথিভুক্ত করার মতো কোন গোত্র বা ক্যাটেগরি তো আমাদের খাতায় নেই!'

(৮) রোগের ধরণ অনুযায়ী সরকারি চিকিৎসায় যে কদিনের চিকিৎসার (এম বি রোগীর এক বছর, পি বি রোগীর ছ'মাস) নিদান দিচ্ছেন, অনেক জায়গাতেই এখন রোগীর হাতে ততদিনের এম ডিটি ওষুধের পাতা ধরিয়ে দিয়ে দায়িত্ব সমাপন করা হচ্ছে। রোগী হয়তো ওষুধ খাচ্ছে, হয়তো ফেলে দিচ্ছে—কি বা আসে যা—নির্দিষ্ট সময়ের পর তার নামটি টুক করে 'চিকিৎসা থেকে খালাস' খাতায় তুলে নিলেই হল। এমনও দেখেছি সরকারি হিসাবমতো পুরো ওষুধ সরকারি চিকিৎসালয় থেকে নিয়ে রোগী খেয়েছেন, এবং তারপরে তাঁর অসাড়তা/স্থানীয় পক্ষাঘাতের বৃদ্ধি ঘটেছে বা রোগী 'প্রতিক্রিয়ার দশা'-য় কষ্ট পাচ্ছেন। এ ব্যাপারটি খুবই সম্ভব এবং এর জন্য সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাও আছে। অথচ রোগীকে সরকারি চিকিৎসালয় বলে দিচ্ছে—'ওটা আপনার কুষ্ঠ নয়, কেন না আপনার তো পুরো চিকিৎসা হয়ে গেছে। পুরো চিকিৎসার পরে কুষ্ঠ? অসম্ভব ব্যাপার, মশাই।' কুষ্ঠ সারুক আর বাড়ুক, তাঁর নাম তো সরকারি নথি থেকে কাটা পড়ে গেছে, আর 'ওপর থেকে' চাপ আছে না মোট রোগীর সংখ্যা কমিয়ে দেখাতে এবং সফলভাবে চিকিৎসিত রোগীর অনুপাত বাড়িয়ে দেখাতে? অবশ্য সরকারি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও আছে। অনেক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী চাপের মুখে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্রেফ রোগীর প্রতি ভালোবাসা আর কর্তব্যবোধের তাগিদে বহু কুষ্ঠরোগীর বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করছেন—এটাই আশার কথা।

২০০৪ সালে প্রকাশি মেডিসিনের সর্বজনস্বীকৃত গ্রন্থ 'হ্যারিসন'স প্রিন্সিপলস অফ্ ইন্টারন্যাল মেডিসিন' সিদ্ধান্ত টানছেন—"জনমানসে যখন ধারণা হচ্ছে যে কুষ্ঠরোগ নির্মূল হবার মুখে, তখন রোগীর চিকিৎসার অর্থ ও উপকরণ দ্রুত অন্য খাতে সরানো হচ্ছে এবং কুষ্ঠরোগী র চিকিৎসার দায় অতি ভারাক্রান্ত বা বাস্তবত নেই-ই এমন এক জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে, যার স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ উপকরণ বা দক্ষতা কোনোটাই নেই, যা দিয়ে রোগনির্ণয়, তার শ্রেণীবিচার, রোগের সূক্ষ্ম তারতম্য বুঝে চিকিৎসা (বিশেষত প্রতিক্রিয়ার দশায় স্নায়ুপ্রদাহের) সম্ভব। এভাবেই সুফলদায়ক চিকিৎসার পূর্বশর্তগুলি ক্রমশ আরো বেশি করে লঙ্ঘিত হচ্ছে।" (পৃ: ৯৬৬-৭২, অনুবাদ বর্তমান প্রাবন্ধিকের) শেষে কুষ্ঠরোগের

সরকারি 'দূরীকরণ' হলেও তার প্রায় বছর দশেক আগে থেকেই সরকারি কাজকর্মে একধরনের তাড়াহুড়ো, 'কুষ্ঠকে গুটি বসন্তের মতই জয় করে ফেলাম বলে।' জাতীয় কথাবার্তা, কুষ্ঠরোগের পরিকাঠামো গুটিয়ে আমার ছক কষা—এসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। সময়টা একবার খেয়াল রাখুন—১৯৯০-এর দশকের মাঝ বরাবর বা তার পরেকার সময়। বাতাসে তখন 'বিশ্বায়ন'-এর ঘ্রাণ। বিশ্বায়ন ও অর্থনীতির উদারীকরণ—এ দুয়ের আন্তর্জাতিক কাণ্ডারি বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের সরকারগুলিকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি 'অলাভজনক' জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচনে হ্রাসের পরামর্শ দিচ্ছে নতুবা ঋণের মিলবে না। ঋণের শর্ত হিসেবে ব্যাঙ্ক-ফাণ্ডের পরামর্শ ছিল 'অনুৎপাদক' খাতে ব্যয় কমানো, কেন না শিক্ষা-স্বাস্থ্যের জন্য সরকারি অর্থ খরচ হয়ে গেলে 'আসল' কাজ অর্থাৎ বড় শিল্পের উপযোগী পরিকাঠামো (যথা সিঙ্গুর বা সানন্দ-এ টাটার ন্যানো গাড়ির কারখানা) বানানোর বা রপ্তানিমুখী অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য টাকা কম পড়তে পারে। অর্থনীতিটা এইভাবে বদলে ফেলার একটা গালভরা নাম দেওয়া হয়েছিল—কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস প্রকল্প (স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম, সংক্ষেপে এম এ পি)। ভারত একটি স্বঘোষিত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। ব্যাঙ্ক-ফাণ্ডের শর্ত মানতে গেলে ভারত রাষ্ট্রটি যেটুকু পয়সা শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সামাজিক সপরক্ষা ইত্যাদি খাতে খরচ করত সেটা কমাতে হয়। নানারকম ওঠাপড়া, সরকার বদল ইত্যাদির মধ্যে দিয়েও ভারত রাষ্ট্রটি এখনও এই 'সংস্কার'-এর রাস্তাতেই হাঁটছে—যদি গত বছরের বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা দেখিয়ে দিয়েছে যে, যে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস তথা সমস্কার যত কম করেছে, বিশ্বাব্যাপী মন্দার ঝড় ঝাপটা সে রাষ্ট্রের গায়ে তত কম লেগেছে।

কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস নিয়ে বিশদ আলোচনার জায়গা এ প্রবন্ধ নয়, আমার উদ্দেশ্যও সেটা নয়। কিন্তু সেই কর্মসূচির যে অ্যাজেন্ডা একটু অতিসরলীকৃতভাবেই এখানে হাজির করলাম তার কারণ আছে। কুষ্ঠ দূরীকরণ-এর সরকারিভাবে ঘোষিত সময় ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫ ধার্য হল—কিন্তু তার পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল নব্বই-এর দশকে। বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক সংস্কারের সেই আবহাওয়ায় জাতীয় কুষ্ঠ নির্মূলীকরণ (এন-লেপ) কর্মসূচির কর্তাব্যক্তিরা কুষ্ঠখাতে খরচকে অপচয় বলে ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেন না স্বাস্থ্য খাতে সমস্ত সরকারি খরচই এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে অপচয়মাত্র, বিশেষ করে কুষ্ঠ আবার গরীব লোকের অসুখ। এই অপচয় রোধে দীর্ঘমেয়াদি কমসূচির ফসল হল কুষ্ঠকে দূরীকৃত ঘোষণা করে এই রোগের আলাদা পরিকাঠামোটি ভেঙ্গে দেওয়া এবং এটারই গালভরা নাম দেওয়া হল সাধারণ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কুষ্ঠ চিকিৎসার আত্মীকরণ!

চিকিৎসার গুণমান

পরিসংখ্যানগত ও পরিমাণগত দিক থেকে কুষ্ঠের চিকিৎসার সরকারি ব্যবস্থাটি মোটামুটি দেখা হল, এবার দেখা যাক এ চিকিৎসার গুণমান কেমন। প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে রিফামপিসিন বলে যে ওষুধটা আমরা মাসে একদিন মাত্র দিই, আমেরিকাতে সেটা দেওয়া হয় রোজ একটা করে। কারণ আর কিছুই নয়, ব্যয়সংকোচ। অথচ ১৯৮০-র দশকে এই ওষুধ যখন প্রথম এম ডি টি-র অঙ্গ হয়ে ওঠে তখনকার তুলনায় এখন এই ওষুধের প্রকৃত বাজারদর অনেক কমেছে। এবং রোগীর সংখ্যা যখন কমে গিয়েছে তখন রোগের ছড়িয়ে পড়া আটকানোর জন্য চটজলদি ব্যবস্থা অর্থাৎ যে করে হোক কম খরচে সমস্ত সংক্রামক রোগীকে দ্রুত অসংক্রামক করে তোলা — এটার আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যাবার কথা। প্রতিটি রোগীকে তার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা করে সর্বশ্রেষ্ঠ ফল লাভ করাটাই এখন এন-লেপ-এর মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বর্তমানে যে যুক্তিতে প্রত্যেক রোগীকে রোজ রিফামপিসিন খাওয়ানো হচ্ছে না তা চিকিৎসাশাস্ত্র দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়, সেটা কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস নামক ছকটির নিজস্ব অর্থনৈতিক যুক্তিতেই বুঝতে হবে। চিকিৎসার গুণমান যথাযথ করার অন্যান্য ধাপগুলি হল—

(১) রোগীর হাতে জীবাণু মারার বড়ির পাতা ধরিয়ে দিয়ে কর্তব্য সারা নয়, সে ওষুধগুলো যথাযথ খাচ্ছে কিনা তার তদারকি প্রয়োজন। আমাদের দেশেই যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় 'ডট্‌স্' পদ্ধতিতে রোগীকে ওষুধ খাওয়ানোর তদারকি করা হয়—কুষ্ঠের ক্ষেত্রে সেই ধাঁচটা আনা সম্ভব।

(২) 'প্রতিক্রিয়ার দশা'-র যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। যতকরা দশ থেকে তিরিশ জনের জীবাণু মারার ওষুধ চলা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়ার দশা হয়ে স্নায়ুপ্রদাহ, অসাড়তা, স্থানীয় পক্ষাঘাত, অঙ্গবিকৃতি ইত্যাদি ঘটে।

(৩) পি বি কুষ্ঠের ক্ষেত্রে ছমাস আর এম বি কুষ্টের জন্য এক বছর—এই চিকিৎসা করার পরেও সবার রোগ সারে না, এমন কি জীবাণুও মরে না। কার কতদিন অতিরিক্ত চিকিৎসা দরকার তা নির্ধারণ ও রূপায়নের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

(৪) ব্যবহৃত তিনটে ওষুধ দিয়ে যেসব এম বি রোগীর দেহে জীবাণু যথেষ্ট কমছে না তাদের জন্য কুষ্ঠরোগের দ্বিতীয় পর্যায়ের ওষুধের ব্যবস্থা প্রয়োজন—এটা এতাবৎ একেবারে অবহেলিত একটা বিষয়।

(৫) যেসব রোগীর অঙ্গবিকৃতি বা কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস ঘটেছে অথবা অসাড় জায়গা (বিশেষত পায়ের তলায়) ঘা হয়ে গিয়েছে, তাদের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে প্লাস্টিক সার্জারি খানিকটা সহায়তা করতে পারে। তার ব্যবস্থা এবং এইসব রোগীদের পুনর্বাসন, সারাজীবন ধরে বিশেষ সহায়তা ও চিকিৎসা

প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারি ঔদাসীন্য চরমতম এবং নিষ্ঠুরতার নামান্তর। (৬) যদিও এ প্রবন্ধে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে, তবু ঘটনা এই যে বহু মানুষ নানা কারণে বেসরকারি চিকিৎসার ওপর নির্ভর করেন। বেসরকারি ব্যবস্থা বলতে গুটিকয় স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, কুষ্ঠাশ্রম এবং ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস, প্রাইভেট হাসপাতাল নার্সিংহোম। যেসব রোগী বেসরকারি ব্যবস্থায় চিকিৎসা নেন তাঁরা সরকারি পরিসংখ্যান থেকে বাদ পড়েন—কুষ্ঠ দূরীকরণ সাফল্যমণ্ডিত হবার পেছনে এটা একটা অন্যতম কারণ—এটা বদলাতে হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে চিকিৎসার পরিসংখ্যান বা গুণমান নিয়ে সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহের কোনও ব্যবস্থা নেই, সুতরাং এ ব্যাপারে যা মন্তব্য এখন আমি করতে বাধ্য হচ্ছি তা একান্তই চিকিৎসক হিসেবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—তথ্যভিত্তিক না হবার কারণে এ মন্তব্যগুলো ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুব বেশি।

আমার অভিজ্ঞতায়, প্রাইভেটে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা মোটের ওপর খারাপ চিকিৎসা করেন না, যদিও অকারণে বেশিদিন ওষুধ চালানো, বেশি ওষুধ লেখা এবং তুলনায় বেশি দামি ওষুধের প্রেসক্রিপশন এই ঝোঁকগুলো বেশ প্রবল। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের বাইরে পাশ-করা ডাক্তারদের কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে ধারণা বেশ কম, কারণ এম বি বি এস সিলেবাসে কুষ্ঠ অবহেলিত, অবহেলিত মেডিক্যাল কলেজগুলোর বাতাবরণে ও শিক্ষকদের মনোজগতে ও। গ্রামীণ ডাক্তার বা হাতুড়ে ডাক্তাররা আবার এঁদের কাছ থেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চিকিৎসাবিদ্যার খানিকটা শেখার চেষ্টা করেন, সুতরাং কুষ্ঠরোগ নির্ণয়ে তাঁদের ক্ষমতাও বেশ কম। প্রসঙ্গত হোমিওপ্যাথ, আয়ুর্বেদ ও উনানি পদ্ধতিতে এ রোগের চিকিৎসা হয় কিনা আমার জানা নেই, এইসব চিকিৎসা ব্যবস্থায় উপকৃত একজন কুষ্ঠরোগীকেও আমি এ তাবৎ দেখিনি।

ঘণ্টা বাঁধবে কে?

কুষ্ঠ নিয়ে এতো কিছু করার আছে—কিন্তু সবার আগে দরকার ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী-নীতিনির্ধারকদের কর্তব্য নিষ্ঠা ও সরকারি পর্যায়ে সততা ও আন্তরিকতা। পরিসংখ্যানে কারিকুরি করে বা অনৃতভাষণের সাহায্যে কুষ্ঠরোগ দূর করা যাবে না। কিন্তু এ ব্যাপারে রাজ্যস্তরে কি কেন্দ্রীয় সরকারে মন্ত্রী-আমলা-উচ্চপর্যায়ের চিকিৎসক-প্রশাসক সকলের ভূমিকাই নঞর্থক, এমন কি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ভূমিকাও সন্দেহজনক। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে সত্যিকারের কুষ্ঠ দূরীকরণের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উপায় রয়েছে এমনটাই মনে হয়। সেগুলোকে অর্থনীতি-রাজনীতির দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহার না করে যথার্থ কাজে লাগালে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে।

স্বাস্থ্যকর্মী ও ডাক্তার হিসেবে আমাদের মনে হয় খুব কম সময়ের মধ্যে কুষ্ঠরোগের প্রকোপ বেশ অনেকখানি কমানো যেতে পারে এবং যেসব মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই খুব বড়ো স্থায়ী ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব যদিও গুটি বসন্তের মতো কুষ্ঠরোগ নির্মূল করা অন্তত এখনকার পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নয়। এই হল আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞানের অবস্থান।

প্রশ্ন হল, বিশ্বায়ন, কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস, অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ধনীকে আরও ধনী ও গরীবকে আরও গরীব করার যে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক প্রক্রিয়াটি চালু আছে, কুষ্ঠের চিকিৎসা কি সেই বৃত্তের বাইরে যেতে পারে? বোধ হয় না।

নিকট অতীতে এই রাজ্যের বুকেই বড়োলোকের স্বার্থ বনাম গরীবের স্বার্থে যে কটি বড় লড়াই আমরা দেখেছি, সেখানে গরীবের লড়াই অনেকটাই আপাত-বিজয় অর্জন করেছে—যদিও মূল ব্যবস্থাটা বদলানোর কথা এখনও ভাবাও যাচ্ছে না। এই পর্যায়ে তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা হল, স্বাস্থ্যের দাবি কি সাধারণ মানুষের, গরীব মানুষের লড়াইয়ের দাবি হয়ে উঠতে পারে?

তা যদি পারে, তবে ডাইরিয়া ইত্যাদি গরীব মানুষের অন্য সব ব্যাধির সঙ্গে কুষ্ঠের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সঠিক, বৈজ্ঞানিক পথে চালনা করা সম্ভব। নতুবা সরকারি মন্ত্রী-আমলাদের ঠাণ্ডাঘরে বসে হাজার মিটিং-এ পরিসংখ্যানের প্যাঁচ-পয়জারই জন্ম নেবে, রোগকে জয় করার রণকৌশল নয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

(১) আমার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রোগীরা, যাঁরা কোন অবস্থাতেই হার মানতে রাজি নন, ও তাঁদের অসীম ত্যাগস্বীকারকারী পরিবারবৃন্দ।

(২) বন্ধুবর ডাঃ বিশ্বরূপ ব্যানার্জি ও 'জনস্বাস্থ্য সহযোগ', বিলাসপুর, ছত্তিশগড়-এর অন্যান্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ।

তথ্যসূত্র :

কিছু কিছু তথ্যসূত্র প্রবন্ধের মধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জার্নাল, বিশেষত Indian Journal of Dermatology, Venereology, Leprology; Indian Journal of Dermetology; Leprosy Review -এর কিছু নিবন্ধ; এবং National Leprosy Eradication Programme -এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। এছাড়া ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরের 'জনস্বাস্থ্য সহযোগ' সংগঠনটি যেসব লেখা ও প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছেন, সেগুলি থেকে অজস্র সহায়তা পেয়েছি। (তথ্যগত ভ্রান্তি থাকলে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বর্তমান প্রবন্ধকারের এবং বক্তব্যের দায়িত্বও সম্পূর্ণত তাঁরই।)

বিজ্ঞানশিক্ষা ও প্রসার নিয়ে সর্বভারতীয় সম্মেলন

আশীষ লাহিড়ী

গত ৫ থেকে ৮ অক্টোবর ২০০৯ পিপ্‌ল্‌স কাউন্সিল অব এডুকেশন, এলাহাবাদ আর মুম্বইয়ের হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন (টি আই এফ আর)-এর যৌথ উদ্যোগে মুম্বইতে বিজ্ঞান শিক্ষা সংক্রান্ত এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধনী ভাষণ দেন হোসঙ্গাবাদ বিজ্ঞান আন্দোলন-খ্যাত ডক্টর অনিল সদ্‌গোপাল। মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ জ্যোতিবা (জ্যোতিরাও) ফুলের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখান দলিত ও শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে সম্পদ নিয়ে সেই সম্পদের সাহায্যেই 'এলিট' শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উনিশ শতক ধ্বনিত হয়ে আসছে। আদিবাসী কিংবা গ্রামের কৃষক ঘরের ছেলেমেয়েদের কাছে সরাসরি বিজ্ঞান পৌঁছতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমটা যে কত জরুরি তা তিনি অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্ত করেন। তাঁর একটি অভিজ্ঞতা এইরকম : ছত্তিসগড় অঞ্চলের একটি গ্রামের ইস্কুলের বিজ্ঞানশিক্ষক জানান যে শত চেষ্টা করেও তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সাড়া পাচ্ছেন না, তারা কোনো উত্তরই দিচ্ছে না। ক্লাসে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। ডঃ সদ্‌গোপাল সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে গিয়ে দেখলেন, কথাটা সত্যি। 'মাস্টারজী' বিশুদ্ধ হিন্দিতে ছাত্রছাত্রীদের (যাদের বয়স ১০ থেকে ১৩-র মধ্যে) একটি সরল সমস্যা দিয়ে তার সমাধানের পথ বাতলাতে বলেছেন কিন্তু একজন ছাত্রও এগিয়ে আসছে না। সমস্যাটি এই : দুটি কাচের গেলাসের একটিতে রয়েছে জল অন্যটিতে রয়েছে কেরোসিন; দুটি জিনিস দেখতে প্রায় একই রকম; কী করে জানা যাবে কোনটিতে কী আছে? ডঃ সদ্‌গোপাল বলেন একজন ছাত্রও কোনো আগ্রহ প্রকাশ না করাতে তিনি তাদের মধ্যে গিয়ে শতরঞ্চিতে বসলেন। শুরু করলেন গল্প, ঐ অঞ্চলের বিশেষ উপভাষায়। তাদের বাড়িতে কে-কে আছে, বাব-মা কী করেন ভাইবোনের খুনসুটি জল আনবার জন্য কতদূরে যেতে হয় ইত্যাদি ও প্রভৃতি। নিমেষের মধ্যে দেখা গেল ছেলেমেয়েদের কলকলানি আর থামে না। এমন কি কে আগে বলবে কে পরে, তা নিয়ে ঝগড়া বাধবার উপক্রম। এইভাবে মিনিট দশ পনেরো কাটবার পর ডঃ সদ্‌গোপাল তাদের বললেন, 'আচ্ছা, মাস্টারজী যে তোমাদের একটা প্রশ্ন জিগ্‌গেস করেছেন তার উত্তরটা কী হল?' অমনি একসঙ্গে দশ-বারোটা হাত উঠল। হরেক রকম সমাধানের কথা বলল তারা। একটি ছেলে বলল, এ তো খুব সোজা। একটা মোটাগোছের কাগজ নিয়ে সামান্য হেলিয়ে তাতে দুটি গেলাস থেকে একটুখানি তরল নিয়ে আলতো করে গড়িয়ে দেব; যেটা বেশি দূর গড়াবে, সেটা জল। কারণ জল কেরোসিনের চেয়ে ভারী জিনিস। একটি মেয়ে বলল দূর অত কষ্ট করব কেন? স্রেফ গন্ধ শুঁকব, তাহলেই বুঝতে পারব কোন্‌টা কী। একটি ডাকাবুকো গোছের ছেলে বলল, আমি একটা দেশলাই জ্বেলে গেলাসের মধ্যে ফেলে দেব; যেটা জ্বলবে সেটা কেরোসিন। শেষ পর্যন্ত তাদের থামানো দায় হয়ে পড়ল, এতই উৎসাহ তাদের।

পশ্চিমবাংলার রবীন মজুমদার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে পরিবেশ-সংক্রান্ত বিজ্ঞানের প্রবেশ কীভাবে ঘটানো যায় তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত কিছু প্রস্তাব রাখেন। মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে হাতেকলমে রসায়নচর্চার ওপর জোর দেন। দেবব্রত পান্ডা অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রচলিত পাঠ্য ক্রমের বিরোধিতা করে বলেন যে-বিশেষ ধরনের অর্থশাস্ত্র ক্লাসে শেখানো হয়, তা বাস্তব পরিস্থিতিকে বুঝতে সাহায্য তো করেই না, উপরন্তু বাস্তবের প্রকৃত মূল্যায়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে। তাঁর প্রস্তাব, কোনো একটা নির্দিষ্ট মতের বা ধরনের অর্থশাস্ত্র না পড়িয়ে নানা মতের নানা ধরনের অর্থনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় ঘটানো হোক, তারপর তারা তাদের বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী যেটা ঠিক মনে করবে সেটা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হোক। মেহের এনজিনিয়ার ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেন। শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ বিষয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন ডঃ সিদ্ধার্থ গুপ্ত। এই লেখকের অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞাননিষ্ঠ, সেকিউলার, যুক্তিবাদী দর্শন ও শিক্ষাদর্শ নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ ঘটেছিল।

বিজ্ঞানী সি কে রাজু পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানের ইতিহাসের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ ঘোষণা করে ভারতীয় বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চার ওপর গুরুত্ব দেন। টি আই এফ আর-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ অরবিন্দ কুমার ক্লাসের বিজ্ঞানপঠনকে বিজ্ঞানের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করবার পরামর্শ দেন। এটা কার্যক্ষেত্রে কী করে করা সম্ভব, তা নিয়ে কিছু বিতর্ক ওঠে। সোলাপুরের পদার্থবিদ্যার স্কুল-শিক্ষক প্রকাশ বুর্তে বলেন ক্লাসঘরের বিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে বাইরের সামাজিক জগতে প্রচলিত ধ্যানধারণার — যথা ধর্মের — সম্পর্ক কী সে বিষয়ে ছাত্রদের অবহিত করা দরকার। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন তিনি কিন্তু কোনো মত বা মতাদর্শ ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার কথা

বলছেন না কেবল পরিবারের বা ব্যাপক সমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণার সঙ্গে ক্লাসে-শেখা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সম্পর্কটা কী, সে বিষয়ে ছাত্রদের ভাবাতে চাইছেন। বিজ্ঞানের শিক্ষাটাকে তারা যেন নিছক ক্লাসঘরের একটা ব্যাপার মনে না করে। টি আই এফ আর-এর তরুণ গবেষক এম এন ভাহিয়া স্কুল কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের সিলেবাসকে অতিরিক্ত গণিতনির্ভর না করে বিষয়ভিত্তিক করবার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা যারা করবে, তাদের ব্যাপক ও গভীর গণিতচর্চা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু যারা গবেষণার দিকে যাবে না অন্য কিছু করবে (তাদের সংখ্যাই বেশি), তাদের ক্ষেত্রে এত তাত্ত্বিক গণিতের বদলে বরং পদার্থবিজ্ঞানের ঘটনাগুলি (ফেনোমেনা) ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করার ওপর বেশি জোর দিলে বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের আগ্রহ আরও বাড়বে বাস্তব জগতের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্কটাও আরো স্পষ্ট হবে। অনুরূপভাবে তামিলনাড়ুর এক বিজ্ঞানশিক্ষা কর্মী বলেন, গণিতের মর্মবস্তুর চেয়ে গণিতের প্রক্রিয়ার ওপর অত্যধিক জোর দিতে গিয়ে শিক্ষকরা অকারণে ছাত্রদের মনে গণিতভীতি তৈরি করেন। যারা অল্পবয়সী, যারা গণিত কী সে বিষয়ে কিছুই জানে না, তাদের মনে আগে থেকেই গণিতভীতি ঢোকানোর জন্য তিনি অভিভাবক ও বয়স্কদের গণিত নিয়ে আলগা মন্তব্য করার অভ্যাসকে দায়ী করেন (যথা, 'অঙ্কের ক্লাসটা কতক্ষণে শেষ হবে, তার জন্য অপেক্ষা করতাম!' 'বাব্বা, ক্লাস ইলেভেনে উঠে আর্টস নিয়ে অঙ্কের হাত থেকে বেঁচেছিলাম!')। তাঁর মতে এইসব মন্তব্য ছোটোদের অবচেতনে ঢুকে গিয়ে আগে থেকেই তার মনে অঙ্ক সম্বন্ধে একটা ভীতি জাগিয়ে রাছে। তামিলনাড়ুর তরকারি-বিক্রেতা এক মহিলাকে অঙ্কে সাক্ষর করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন তিন। এই মহিলা প্রথমে অঙ্ক শেখার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। কিন্তু যখনই দেখলেন অন্য কারো সাহায্য না নিয়েই তিনি তাঁর সারাদিনের কেনাবেচার লাভ - লোকসানের হিসেবটা করতে পারছেন, তখনই তাঁর অঙ্ক শেখার আগ্রহ ও উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে যায়। জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে শিক্ষা দিতে পারলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-বঞ্চিত মানুষদের কাছে শিক্ষা হয়ে ওঠে নিঃশ্বাসবায়ু কিংবা জলের মতোই অপরিহার্য একটি জিনিস।

ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-এর নামকরা বিজ্ঞানী সি দেসিরাজু বলেন, একেবারে নিম্নতম স্তর থেকে ব্যাপকতম সংখ্যক মানুষের কাছে প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা যদি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা না করা যায়, তবে একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গুণী বিজ্ঞানীর সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যেতে বাধ্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সংখ্যা গুণমানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। একেবারে নীচের দিকে যত বেশি মানুষকে বিজ্ঞান-সাক্ষর করা যাবে, একেবারে ওপরের দিকে উঁচু মানের গবেষক পাওয়ার সম্ভাবনা ততই বাড়বে। জিনিসটা পিরামিডের মতো : ভূমিটা যতখানি বিস্তৃত হবে, চূড়াটা ততই উঁচুতে উঠবে। নিরক্ষর নিম্নবর্গীয় মানুষের মধ্যে বিপুল বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ব্যবহারের অপেক্ষায় পড়ে আছে বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি আবার উচ্চ পর্যায়ে একেবারে নিখাদ 'এলিটিস্ট' শিক্ষার সপক্ষে মত প্রকাশ করে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি করেন। কেন নোবেল পুরস্কার অর্জনটাকেই বিজ্ঞানে অগ্রগতির মাপকাঠি বলে ধরতে হবে, সেটা তাঁর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হল না। মাও সে তুঙ নাকি রাজনৈতিক কারণে চেয়েছিলেন, চীন দেশের সাধারণ মানুষ অশিক্ষিত হয়ে অর্ধাহারে থাকুক, তাঁর মতো প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর কাছ থেকে এ হেন অনৈতিহাসিক ও অবিমৃষ্যকারী মন্তব্যও অনেককে পীড়া দেয়।

সাধারণভাবে টুকরো টুকরো বিষয়ে বিভক্ত খণ্ডাত্মক (রিডাক্শনিস্টিক) শিক্ষার বদলে পূর্ণাত্মক (হোলিস্টিক) এক বিকল্প শিক্ষাদর্শ গড়ে তোলার ওপর জোর দেন প্রায় সকলেই, যেখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় আর মানবিকী বিদ্যার মধ্যে অকারণ দেয়াল তোলা হবে না। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজির শিক্ষাদর্শের কথা বারবার উঠে আসে। যদিও মননক্ষেত্রে একেবারে ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা এই দুই মনীষীর শিক্ষাদর্শকে কী করে মেলানো সম্ভব সে প্রশ্নটা কেউই পরিষ্কার করতে পারেননি।

সব মিলিয়ে এ ছিল এক অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ ও প্রয়োজনীয় সম্মেলন।

এখানে ওখানে

১৯৯৬-২০০০ সারা দেশে যত মেয়ের বিয়ে হয়েছে তার ৩৭ ভাগই নাবালিকা। এ ব্যাপারে আমাদের রাজ্য সপ্তম স্থানে। জেলাগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদ শীর্ষে, তারপরই বীরভূম। বাংলাদেশের লাগোয়া জেলাগুলিতে মেয়েপাচার চক্র খুবই সক্রিয় সেজন্যই মালদা, নদীয়া ও কোচবিহারে নাবালিকা বিয়ের সংখ্যাও খুব বেশি। এসব জেলাতে ১৫ বছরের কমবয়সী মেয়েরা গর্ভধারণ করছে, আর ১৯ বছর হবার আগেই মা হচ্ছে। এত বেআইনি বিয়ে, অথচ মাত্র আট ভাগ অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়। ২০০৬-এর চিত্র এটি। পণ/যৌতুক না দেওয়ার জন্যে সারাদেশে যত নারীহত্যা হয় তাতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ৫ম। আমাদের রাজ্যের আগে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ। আর মেয়েদের ওপর অত্যাচারে আমরা এক নম্বরে। The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 প্রয়োগ করা হয় না বললেই চলে। এই সব নির্যাতিতাদের রক্ষাকর্তা সুরক্ষা আধিকারিক (Protection Officer) সারা রাজ্যে মাত্র ১৯জন। এদের কাজ হল আইন ঠিকঠাক প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা দেখা।

সংবাদসূত্র : The Statesman - 27/11/2009

National Family Health Survey Report পুস্তিকাটি থেকে এমন সব তথ্য পাওয়া গেছে। এটি বের করেছে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ বিভাগ।

আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ ও পাথর

শশবিন্দু চৌধুরী

গোরাগাছার এই প্ল্যান্টে এখন হটমিক্স তৈরি হয়।

সম্প্রতি আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ হবে- সংবাদপত্রে খবরটি নিয়ে বেশ হৈচৈ হচ্ছে দেখতে পেলাম। যেন কলকাতায় কোনো অভিনব ঘটনা ঘটতে চলেছে। কিন্তু ঘটনা হল, এই উদ্যোগে কোনো নতুনত্ব নেই, কারণ কলকাতা এক-আধ দিন নয়, প্রায় সাত-আট দশক আগে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। প্রকৌশলী হিসাবে নবতিপর এই বৃদ্ধের সে সময় সুযোগ হয়েছিল সেই কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার। তাই এ বিষয়ে যতটুকু জানা আছে সেটুকুমাত্র নিবেদন করছি।

১৯২১ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত কলকাতা পুরসভা দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র বসু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ১৯২৩-২৪ সাল নাগাদ ডঃ বি এন দে কলকাতা পুরসভায় কারিগরি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ডঃ দে সম্ভবত জার্মানিতে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডক্টরেট করেন। এঁর পুরো নাম ভুলে যাওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। ডঃ দে-র ইংরাজ বৈরী প্রায় প্রবাদের মতন। হয়ত সেই কারণে নেতাজির সঙ্গে তাঁর গভীর হৃদ্যতা ছিল। কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহকারী কোম্পানি ছিল ইংরাজদের। টালাতে উঁচুতে অবস্থিত জলাধারে জল তোলার জন্য যখন বড় পাম্প বসাবার প্রয়োজন হল তখন তিনি ইংরাজদের সাথে যোগাযোগ এড়াবার জন্য প্রথমে ওখানেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে পাম্প চালাবার পরিকল্পনা পেশ করেন। সেই পরিকল্পনা ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সরাসরি নাকচ করে দেয়। তখন ডঃ দে বাষ্পচালিত পাম্প ব্যবহারের পরিকল্পনা দেন এবং দেখান যে এর দ্বারা খরচ কম হবে। সেই পাম্পগুলি বোধহয় ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত কার্যকরি ছিল।

কলকাতা নিয়ে তাঁর অনেকগুলি পরিকল্পনা ছিল। তার মধ্যে একটি বর্তমান লবণহ্রদ প্রকল্প। দ্বিতীয় বড় পরিকল্পনা কলকাতার আবর্জনা সমস্যার সমাধান। এই পরিকল্পনায় আবর্জনা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন আর তার সঙ্গে যেটা যুগান্তকারী সেটা হচ্ছে — **সেই আবর্জনা পোড়াবার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা থেকে পাথর করা।** আমার যতদূর জানা আছে, আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ বহু শহরেই আছে। কিন্তু তার দগ্ধাবশেষ থেকে কোথাও পাথর করা হয় না।

বর্তমানে কয়লা ব্যবহৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রে কয়লাকে প্রায় আটা সদৃশ চূর্ণে পরিণত করে জ্বালানো হয়। জ্বলবার পর ধূলিসদৃশ পদার্থ নীচে পড়ে। সেই ধূলি দিয়ে ইট করা যায়। বর্তমানে কয়েকটি ইট কারখানা এই ধূলি ব্যবহার করে। কোনো কোনো কয়লার ধূলি হালকা হয়ে জ্বালানি হাওয়ার সাথে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে, যা কারখানার চারদিকের আবহাওয়া দূষিত করে। যেমন কোলাঘাটে মাঝেমাঝেই হয়েছে।

কলকাতার প্ল্যান্টটিতে এই বর্জিত ধূলি একটি 'রোটারি কিল্ন্'-এ বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয়। আমাদের কাছে যা সমধিক পরিচিত সেই পদার্থ 'সিমেন্ট'। 'রোটারি কিল্ন্' থেকে 'সিমেন্ট' ছোটো নুড়ির আকারেই বার হয়। এই নুড়িগুলো দুঁড়ো করে, তার সাথে অন্য একটি পদার্থ মিশিয়ে বিক্রি-সাপেক্ষ 'সিমেন্ট' তৈরি করা হয়। আমাদের আলোচিত প্ল্যান্টটিতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

এর জন্য যে বিরাট অর্থের প্রয়োজন তখন তা ছিল ইংরাজদের হাতে। তারা প্রথমে এর বিরোধিতা করল। তারপর জানাল, যন্ত্রটি ইংল্যান্ড থেকে আনাতে হবে। সেটাতে পৌরসভার কংগ্রেস দল বা ডঃ দে কেউই রাজি ছিলেন না। ইংরাজ পক্ষের যুক্তি ছিল যে এটা পরীক্ষিত পদ্ধতি নয়, তাই প্রথমে একটি পরীক্ষামূলক যন্ত্র করা হবে। সেটার কার্যকারিতা দেখে ভবিষ্যতের নীতি নির্ধারণ করা হবে। সব পক্ষই এতে রাজি হয়।

দৈনিক ১০০ টন আবর্জনা পোড়াবার যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয় তাতে চেকোস্লোভাকিয়ার স্কোডা কোম্পানির দর সব থেকে কম হওয়াতে স্বদেশী অংশ খুশি হয়। তখন কলকাতায় দৈনিক আবর্জনা প্রায় ২০০০ টন। ১৯৩৮

সালে কাজ শুরু হয় ও ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি যন্ত্রটি প্রথম চালু হয়। বর্তমান আলিপুরের টাকশালের পেছনের অংশের তখনকার নাম — গোরাগাছা। ওখানে ওই যন্ত্রটি বসানো হয়েছিল। তখন ওখানে বিদ্যুতের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই ওই যন্ত্র চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ওই যন্ত্রতেই উৎপাদন করা হ'ত। যন্ত্রটি চালাতে ১০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হ'ত। ওটাতে যে বয়লার ও জেনারেটার ছিল তা ১০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম ছিল।

পরীক্ষামূলকভাবে চালনার সময় একটি সামান্য ত্রুটি ধরা পড়ে। সেটা হচ্ছে উষ্ণতার জন্য দৈর্ঘ বৃদ্ধির হিসাব বা কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগে অনবধানতা। সে ত্রুটি সারাতে সারাতেই মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ফলে যন্ত্রটি আইনত হস্তান্তর করা হল না। পুরসভা অবশ্য ১৯৪১ সাল পর্যন্ত যন্ত্রটি চালিয়েছে। যুদ্ধের ঢেউ কলকাতাতে পৌঁছলে, সৈন্যবাহিনী জায়গাটি দখল করে ও ক্যাম্প বসায়। ওই যন্ত্রটি আইনত বিদেশী বলে ওটি নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

প্ল্যান্টটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে থাকে আনুমানিক ১৯৬৫ পর্যন্ত। সেই সময় কলকাতায় আবর্জনা অপসারণ সমস্যা তীব্র হয়ে দেখা দেয়। তখন এই যন্ত্রটি পুনরায় চালু করার কথা পুরসভার মনে হয়। তারা স্কোডাকে চিঠি দেয়। উত্তরে স্কোডা জানায় যে তাঁদের কাছে এর কোনো আর তথ্য নেই। কেবল এক প্রবীণ ব্যক্তির কাছ থেকে জেনে ওরা জানায় যে পৌরসভার জনৈক বাগচী নামের প্রকৌশলী যিনি পুরসভার পক্ষ থেকে এর দায়িত্বে ছিলেন, তিনি এর নাড়ী নক্ষত্র জানেন। তিনি হয়ত সাহায্য করতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় তিনি অবসর গ্রহণের পর শ্রী সরোজপাণি চৌধুরী মহাশয়ের বরানগরের কারখানায় প্রায়শ আসতেন। দুজনেই বেনারস ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। শ্রী বাগচী চৌধুরী মহাশয়ের অনুজপ্রতিম ছিলেন। বয়সের পার্থক্য দশের বেশি। আমিও সেই কারখানায় তখন কর্মরত ছিলাম। বাগচী মহাশয় আমাকে গোরাগাছায় নিয়ে গেলেন এবং আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দেখালেন ও বোঝালেন। ওখানে পুরসভার কয়েকজন কর্মী ছিলেন। তাঁরা সবাই বাগচীর অধীনে কাজ করেছেন ফলে আমরা অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার পেলাম। পুরোনো খাতাপত্র দেখলাম, যাকে কারখানার ভাষায় 'লগ বুক' বলা হয়। তখন তিনি আমার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন, এটা সারিয়ে চালু করা যাবে কি না? এবং তার জন্য কত খরচ পড়বে? আমি তাৎক্ষণিক ভাবেই জানাই এটা সারানো সম্ভব। কেবল একটি পাখা বাইরে থাকার জন্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ওই ধরনের পাখা পাওয়া যাবে না, ওর বদলে অন্য ধরনের পাখা দিয়ে ওর কাজ করাতে হবে। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে পুরকর্মীগণ সুচারুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে বিশ বছরের বেশি সময় ধরে সময় পড়ে থাকা সত্ত্বেও যন্ত্রপাতিগুলি তখনো ভাল অবস্থায় ছিল। কারখানায় ফিরে সবার সঙ্গে আলোচনার পর স্থির হলো পুরসভার কাছে চার লক্ষ টাকা চাইব এবং তিন মাসের মধ্যে এটা চালু করব ও এক মাস এটা চালু রাখার তদারকি করব। এই কাজ সামাজিক কর্তব্য হিসাবে বিনা লাভে করা স্থির হয়েছিল। এর মাঝে কলকাতার আবর্জনা সমস্যা কিঞ্চিৎ সুরাহা হওয়াতে এই প্ল্যান্টটি চালু করার পরিকল্পনা ধামা চাপা পড়ে গেল।

সম্ভবত ১৯৬৯ সালে কলকাতায় আবর্জনার সমস্যা আবার বড় আকারে দেখা দেয়। এবার তদানীন্তন ডেপুটি মেয়র পুরসভার পক্ষ থেকে সরাসরি আমাদের লিখলেন। আমরা আবার সরেজমিনে তদন্ত করে আমাদের শর্তগুলি জানালাম। ওই জায়গায় একটি ছাদ নষ্ট হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে ইস্পাতের দামও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবার খরচ বেড়ে দাঁড়ালো বার লক্ষ টাকা। সময়সীমা চার মাস।

বার কয়েক দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর পুরসভা কার্যত রাজি হয়ে গেলেন কাজটি করার জন্য। ঠিক এই সময়ে পুরসভার নির্বাচন হল এবং তাতে পুরসভায় চালক দলের হার হল। নতুন পুরসভা তাদের কর্মপ্রণালী নির্ধারণ করার আগেই কলকাতার আবর্জনা সমস্যা আবার সাময়িক ভাবে তার তীব্রতা হারালো, তাই সমস্ত ব্যাপারটাই ধামাচাপা পড়ে গেল। চল্লিশ বছর আগেকার কথা তাই সমস্ত সংখ্যাই আনুমানিক।

এরপরেও কিছু ঘটনা ঘটেছে। আমার এক বন্ধু CMDA -তে ছিলেন। তাঁর অনুরোধে কলকাতার আবর্জনা সার্বিক ব্যবহার করে কতটা বিদ্যুৎ ও পাথর পাওয়া যেতে পারে তার রূপরেখা দিয়ে একটা ছোটো প্রবন্ধ লিখে দিতে অনুরুদ্ধ হলাম। সে প্রবন্ধ তিনি CMDA কার্যালয়ে জমা দেন। কয়েক মাস পরে CMDA কর্তৃপক্ষ আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন প্রাক্তন আকাশবাণী ভবনে ওই কার্যালয় অবস্থিত ছিল।

আবর্জনা পোড়াবার জন্য কলকাতায় যে প্ল্যান্ট ছিল, তার 'লগ বুক' থেকে হিসাব করে কলকাতার আবর্জনার উত্তাপমান নির্ণয় করা ছিল। সেই মান আমি সর্বদা ব্যবহার করেছি। এর সাথে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমেরিকা নিবাসী এক ব্যক্তিকে CMDA তাদের আবর্জনা সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর মত অনুযায়ী কলকাতার আবর্জনায় প্রচুর পরিমাণে 'সেরামিক চূর্ণ' মিশ্রিত আছে, তাই কলকাতার আবর্জনা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব নয়। সেই কারণেই কলকাতার আবর্জনা দিয়ে জৈব সার করতে হবে। বক্তব্যটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তথাকথিত বিশেষজ্ঞটি চা খাবার মাটির ভাঁড়গুলিকে 'সেরামিক চূর্ণ' নামে অভিহিত করেছেন।

তখন খোঁজ নিয়ে জেনেছি, কলকাতায় দিনে ৫০ টনের বেশি মাটির ভাঁড়ের মাটি আসে না। তার বৃহত্তর অংশ চায়ের ভাঁড় তৈরি হলেও তার পরিমাণ ৫০ টনের কম। আর আবর্জনায় জ্বালানির অংশ কম থাকলে তা দিয়ে জৈবসার করা যায় না। যা দিয়ে জৈবসার হয় তা সর্বদা দাহ্য। প্রাক্তন 'লগ বুক' থেকে দেখেছি কলকাতার আবর্জনায় অদাহ্য পদার্থ প্রায় ৪৫% ভাগ। অর্থাৎ দাহ্য পদার্থ ৫০% -এর বেশি আর সেই দাহ্য পদার্থের ভেতরে কিছু অংশ অবশ্য জৈবসারের জন্য অনুপযোগী।

সেই প্রবন্ধে লেখা ছিল — কলকাতায় দৈনিক প্রায় ৪০০০ টন আবর্জনা পাওয়া যায়। তার থেকে প্রায় ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আর প্রায় ১৫০০ থেকে ২০০০ টন পাথর প্রতিদিন পাওয়া যাবে।

CMDA-এর সাথে একদিন আলোচনায় বসা হল। একদিকে প্রবন্ধলেখক অন্য দিকে ডঃ চ্যাটার্জী, আমেরিকাদেশীয় বিশেষজ্ঞ ও দুই/তিন জন CMDA কর্মী। প্রথমেই ডঃ চ্যাটার্জী ও সেই বিশেষজ্ঞ বললেন যে, কলকাতার আবর্জনার উত্তাপমান আমি যা উল্লেখ করেছি তা হতে পারে না। ওরা অবশ্য নিজেদের বিশ্বাসের কথা বলছিলেন। তার কোনো বৈজ্ঞানিক বা প্রকৌশলী ভিত্তি ছিল না। বারে বারে একই কথা বলা হচ্ছিল যে 'সেরামিক চূর্ণ'তে কলকাতার আবর্জনা সম্পৃক্ত। বিদ্যুৎ না করার পক্ষে ওদের অন্য যুক্তি ছিল — আবর্জনা থেকে পাথর করা যায় না। আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মৃদু প্রতিবাদ করেছিলাম, যেহেতু আলোচনার শুরুতেই ওরা জানিয়ে দিয়েছিলেন বেশিক্ষণ আলোচনা চালানো যাবে না কারণ বিশেষ কাজে নাকি দুই প্রধানকে বাইরে যেতে হবে।

আলোচনা শেষে আমি সোজা গোরাগাছায় গিয়ে বিভিন্ন মাপের কয়েকটি পাথর সংগ্রহ করলাম। বিদ্যুৎ ও পাথর করার প্রচেষ্টা এই কথা জানার পর ওখানকার কর্মীগণ আমাকে পাথরগুলি উৎসাহের সঙ্গেই সংগ্রহ করতে দিলেন। আমি পাথরগুলি নিয়ে আবার CMDA কার্যালয়ে গিয়ে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের দেখিয়ে ওখানেই এক কোণে রেখে দিলাম। পরের নির্ধারিত দিনে — সেদিন শনিবার ছিল, এ কথা মনে আছে — যথা সময়ে উপস্থিত হলাম। দুই প্রধান প্রথমেই আরম্ভ করলেন যে কলকাতার আবর্জনার উত্তাপমান আমার নির্ধারিত সংখ্যার কাছাকাছি হতে পারে না। আমি সবিনয়ে নিবেদন করলাম যে উত্তাপ নিয়েই কাজ করি আর গোরাগাছায় যে তথ্য আছে তা থেকে আমি ওই সংখ্যাটি পাই। তখন ডঃ চ্যাটার্জী বললেন যে আমরা কলকাতার ইনস্টিটিউট হাইজিনকে আবর্জনার উত্তাপমান নির্ণয় করার দায়িত্ব দিতে পারি। আমি সানন্দে রাজি হয়েছিলাম।

এরপর আপত্তি করলেন পাথর করা যায় না এবং আমেরিকাতেও এরকম কোনো নজির নেই। আমি মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললাম পাথর করা হয়েছে। তারপরেও তারা একইভাবে তাদের নিজেদের বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আমি উত্তেজিত হয়ে অত্যন্ত অশোভনভাবে টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে চিৎকার করে বললাম, 'ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমেরিকাই শেষ কথা নয়।' তখন অন্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা বললেন, 'আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বললাম 'আমি বলছি করা হয়েছে আর ওরা বলছেন করা যায় না। ওরা বলতে পারতেন কোথায় করা হয়েছে জানান।' এরপর আমি পূর্বে সংগৃহীত পাথরগুলি টেবিলের ওপর রেখে বললাম 'এগুলি কলকাতায় ১৯৩৯ সালে তৈরি করা হয়েছিল। আমাকে আশ্চর্য করে ডাঃ চ্যাটার্জী জানালেন যে, ১৯৩৮ সালে শিবপুরের শেষ পরীক্ষার পর অল্প কিছুদিন এখানে শিক্ষার্থী হিসেবে কাজ করেছেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পূর্বেই আমেরিকা পাড়ি দেন। তারপর বললেন যে ওগুলো ফাঁপা হবে তাই ওগুলো দিয়ে কোনো কাজ করা যাবে না। আমি আবার সবিনয়ে জানালাম যে, ঢালাই কারখানা থেকে যে গাদ বার হয় এগুলো তার মতন আর এগুলো রাস্তা সারানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। ওরা বললেন, ওগুলো দিয়ে রাস্তা সারানো হয় না।

সার্বিক বিষয়ে আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমাদের অধিবেশন সমাপ্ত হল। সেদিন আমি গাড়ি নিয়ে যাই নি। জানলাম ডঃ চ্যাটার্জী 'ডানলপ ব্রীজ'-এর কাছে থাকেন। আমি সিঁথির মোড়ে আসব জেনে আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিলেন। টালার পুল পার হবার পরই আমি ডাঃ চ্যাটার্জীকে দেখালাম যে রাস্তার ধারে আমার দেখানো ফাঁপা পাথর পড়ে আছে এবং ধরমবীরের আদেশক্রমে বিটি রোড তাড়াতাড়ি সারানোর জন্য এই পাথরই ব্যবহার করা হয়েছে এবং কাজ মোটেই খারাপ হয় নি।

অতীব আনন্দের কথা যে ইনস্টিটিউট হাইজিন ছয় মাস পরে কলকাতার আবর্জনার উত্তাপমান প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই সংখ্যা আমার নির্ধারিত সংখ্যার সাথে হুবহু মিলে গিয়েছিল। এর কৃতিত্ব আমার নয়, কৃতিত্ব তাঁদের যাঁরা ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ওই প্ল্যান্টটি চালিয়েছিলেন ও যত্ন করে সেই সংখ্যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং যাঁরা ১৯৪১ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যগুলি সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন তাঁদের।

আমি যতদূর জানি এ নিয়ে তারপর আর কোনো উচ্চবাচ্য হয় নি। আজকাল হঠাৎ দেখছি আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ করা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে এবং পুরোনো বৃত্তান্ত না জেনেই বলা হচ্ছে এ নাকি অভিনব উদ্যোগ।

মুক্তি আন্দোলন দমনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ

দিলীপকুমার গুপ্ত

প্রেক্ষাপট

১৯৩৯-এ ইয়োরোপ ছিল অগ্নিগর্ভ। সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখে হিটলারের জার্মান নাৎসি বাহিনী ড্যানজিগ শহরকে উপলক্ষ করে আক্রমণ করল পোল্যান্ডকে। সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যালিনের লালফৌজও পূব দিক থেকে ঢুকে পড়ে নাৎসিদের সঙ্গে আধাআধি বখরা করে নিল দেশটার। ৩ সেপ্টেম্বর জার্মানি ও ইতালির বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা করল ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ঐ একই দিনে ভারতের বড়লাট লিনলিথগো কোনো জাতীয় নেতার মতামতের তোয়াক্কা না করে ভারতকেও জুড়ে দিলেন যুদ্ধে এবং অর্ডিনান্সের মাধ্যমে সব রকম সভাসমিতি নিষিদ্ধ, সংবাদ প্রকাশের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ ও যে কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখার আদেশ জারি করলেন। ভারতে জাতীয়তাবাদীদের কাছে ইয়োরোপের এই যুদ্ধ তখন ছিল পররাজ্যলোলুপ কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের নিজেদের মধ্যে লড়াই। জোর করে ভারতকে এই যুদ্ধে জুড়ে দেওয়া হলেও দেশবাসীদের মত ছিল এই লড়াইতে না এক পাই, না এক ভাই। ১৯৪০-এর জুন মাসে ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করল জার্মানির কাছে।

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পরবর্তী এক বৎসর ভারতে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল মূলত অহিংস ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের মধ্যে, কারণ গান্ধিজি, জওহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যুদ্ধে বিপন্ন ব্রিটিশ সরকারকে আরো বিব্রত করতে আগ্রহী ছিলেন না। যুদ্ধ নাটকীয় মোড় নিল ১৯৪১-এর ২২শে জুন যখন অনাক্রমণ চুক্তিভঙ্গ করে হিটলারের সৈন্যবাহিনী রাশিয়ার মাটিতে ঢুকে পড়ল। বৎসরের শেষ ভাগে ডিসেম্বরের ৭ তারিখে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের পার্ল-হারবার আক্রমণ করে প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করল মার্কিন নৌবহরের। অক্ষশক্তির ইতালি আগে থেকেই আবিসিনিয়ায় যুদ্ধরত ছিল, জাপান ছিল চীনে। এবার আমেরিকাও জড়িয়ে পড়াতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রকৃতই বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হল। মহাযুদ্ধের শুরুতে জার্মানি দ্রুতবেগে ইয়োরোপের ছোট দেশগুলোকে দখল করে নিয়েছিল। জাপানিরা দ্রুততর বেগে সমুদ্র-উপকূলে ও দ্বীপপুঞ্জে ইরোরোপীয় উপনিবেশগুলিকে তাদের দখলে নিয়ে এল। ম্যানিলার পতন হল '৪২-এর ২ জানুয়ারি ১৫ই ফেব্রুয়ারি গেল সিঙ্গাপুর। রেঙ্গুন দখল হয়ে গেল ৮ মার্চ। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, যেখানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাঠানো হত নির্বাসন দন্ড ভোগ করার জন্য, জাপানিদের হাতে চলে গেল ২৩শে মার্চ। যুদ্ধ চলে এল ভারতের দোরগোড়ায়। দিশেহারা ব্রিটিশ সরকার ধরে নিল জাপানিদের পরবর্তী লক্ষ্য হবে কলকাতা এবং তারা আসবে জলপথে। মেদিনীপুরে পূর্ব উপকূলের কাঁথি এবং তমলুক হবে তাদের অবতরণের সম্ভাব্যতম স্থান। ক্ষুদিরামের এই জেলাটি চিরকালই স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠস্থান। এখানে নিহত হয়েছেন তিন ব্রিটিশ জেলাশাসক ডগলাস, পেডি ও বার্জ। এদিকে কমিউনিস্টদের সহায়তায় সুভাষচন্দ্র '৪১-এর জানুয়ারিতে গোপনে দেশত্যাগ করে ইয়োরোপের আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে ক্রমাগত ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে একবার যদি জাপানি বাহিনী মেদিনীপুরে উপকূলে অবতরণ করতে পারে তবে কলকাতার পতন অনিবার্য। দেশকে যেদিন জোর করে যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিন জারি করা ভারত রক্ষা আইনের বলে সমগ্র বাংলার উপকূলের পথঘাট থেকে সরিয়ে দেওয়া হল সমস্ত দ্রুতগামী যানবাহন ট্রাক, বাস, ট্যাক্সি ইত্যাদি। এই আদেশে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল চট্টগ্রাম, দক্ষিণ পরগনা ও বিশেষভাবে মেদিনীপুর জেলা। এই অঞ্চলগুলিই ছিল উপকূলে সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ। প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির জন্য যুদ্ধচাঁদা দিতে ও যুদ্ধবন্ড কিনতে জোর করে বাধ্য করা হয়েছিল অতি দরিদ্র গ্রামবাসীদেরও। শুধু অর্থ নয়, পুরুষানুক্রমে ভোগ করা চাষের জমিও ছাড়তে হল অনেককে সৈন্যদলের ছাউনি ও যুদ্ধবিমানের ঘাঁটি তৈরি করার প্রয়োজনে। জমির কিছু মূল্য তারা পেয়েছিল, কিন্তু ভবিষ্যৎ রুজি রোজগারের ব্যবস্থা তাদের জন্য সরকার সেদিন চিন্তাই করে নি। এভাবে উৎখাত হয়ে যাওয়া পরিবারের সংখ্যা সমগ্র বাংলায় ছিল প্রায় ৩৬ হাজার অর্থাৎ এর ওপর নির্ভরশীল এক লক্ষ আশি হাজার নরনারী ও শিশু।

এদিকে যুদ্ধে ক্রমশ পশ্চাদপর ব্রিটিশদের প্রভূত ক্ষতিসাধন

করছিল বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে জাপানি নৌ ও বিমানবহর। কাঁকিনারা ও বিশাখাপত্তনমের নৌ ঘাঁটির ওপর জাপানি বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হল ৬ এপ্রিল। দু'দিন পর জারি হল নৌকা-বঞ্চনা অধ্যাদেশ। ৯ ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্র-উপকূল থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উজানে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে সব নৌকোকে, যাতে উপকূলে কোনো সম্ভাব্য জাপানি অবতরণকারী ঐ নৌকা ব্যবহার করতে না পারে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত নৌকোর সরে যাওয়ার উপায় ছিল না। সেই সব নৌকাকে হয় পুড়িয়ে দেওয়া হল, আর না হয় ডুবিয়ে দেওয়া হল। এই নৌকাগুলির কিছু ছিল উপকূলের মৎস্যজীবীদের, কিছু খেয়া নৌকা যা ছিল বিভিন্ন জীবিকায় নিযুক্ত জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য, আর কিছু বড়ো মাপের নৌকা যা ব্যবহৃত হত কামার, কুমোর, তাঁতি, চাষীর উৎপাদিত সামগ্রী গ্রামীণ হাট অথবা গঞ্জে নিয়ে যাবার জন্য। পূবে চট্টগ্রাম জেলা থেকে পশ্চিমে মেদিনীপুর পর্যন্ত উপকূল অঞ্চলে প্রায় ৬৬,৫০০ নৌকা বিনষ্ট হয়েছিল, যার ওপর নির্ভরশীল ছিল কয়েক লক্ষ গ্রাম ও গঞ্জবাসীর জীবন। তাদের উপার্জনের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। একই সঙ্গে যুক্ত হল কাঁথি তমলুক থেকে বাইসাইকেল অপসারণ যা ছিল বহু লোকের অতি প্রয়োজনীয় সহজ বাহন। খাদ্যশস্য যাতে শত্রুপক্ষের হাতে না পড়ে সেই অজুহাতে নৌকা ও সাইকেল বঞ্চনার সঙ্গে চালু হল চাল বঞ্চনা নীতি। সেনাবাহিনী ও সরকারের প্রয়োজনে গ্রামগঞ্জের স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সরিয়ে দিয়ে বহিরাগত দালালের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য চালু বাজারদর থেকে কম দামে সরকারের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করা হল গ্রামীণ উৎপাদকদের। জাপানি বিমান হানার আশঙ্কায় জারি সান্ধ্য আইনে বন্ধ হয়ে গেল গ্রামীণ সংস্কৃতি ও বিনোদনের অবলম্বন যাত্রাপালা ও কীর্তনের আসর। জাপানিদের প্রথম দর্শনের পরই উপকূল অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল ব্রিটিশেরা এবলং ইয়োরোপের পোড়ামাটি নীতি এখানে নৌকা বঞ্চনা, চাল বঞ্চনা ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যকর করছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের পদদলিত না হয়েও বাংলার উপকূল অঞ্চলের অধিবাসীরা সেদিন তাদের রক্ষাকর্তার হাতেই বিজিতের লাঞ্ছনা ভোগ করছিল। সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেদিনীপুরে অসন্তোষ ক্রমশই ধূমায়িত হচ্ছিল।

জাপানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল, তারা যাতে ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসে একটা সমঝোতায় আসে, যার ফলে ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় জাপানি আক্রমণের বিরোধিতা করতে আগ্রহী হয়। পোর্ট ব্লেয়ারের পতনের পর স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ মন্ত্রী আলোচনার জন্য দিল্লি আসেন। তাদের দৌত্য বিফল হয়েছিল। জাতীয় নেতৃবৃন্দ ৮ আগস্ট বোম্বে নগরে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে জানালেন 'যুদ্ধ, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ভবিষ্যতের জন্য ভারতের ওপর ব্রিটিশ শাসনের অবসান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আশু প্রয়োজন। একটি স্বাধীন ভারতই তার সর্বশক্তি দিয়ে নাৎসীবাদী, ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে।' ব্রিটিশকে ভারত ছাড়ার আহ্বান জানিয়ে ঐ প্রস্তাবের উপসংহারে বলা হল 'হয়তো এমন একটা সময় আসবে যখন কোনো কংগ্রেস কমিটি কাজ করতে পারবে না এবং জনসাধারণের কাছে কোনো নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে না।' সেক্ষেত্রে 'প্রতিটি স্বাধীনতা-সংগ্রামীকে নিজের নিজের পথে অনলসভাবে কঠোর সংগ্রাম করে যেতে হবে, যতদিন না ভারতের স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জিত হচ্ছে।' পরদিনই সব জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হল এবং কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করা হল।

বিভিন্ন নিপীড়নের ফলে মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের জনসাধারণ পূর্বেই বিদ্বিষ্ট হয়ে ছিলেন, এবারে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক তাদের সক্রিয় বিরোধিতার পথে নিয়ে এল। নেতারা কারারুদ্ধ, স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে। নৌকা বঞ্চনার সঙ্গে সঙ্গে বাস, মোটর ট্যাক্সি, সাইকেল বঞ্চনার ফলে পথে সাধারণের ব্যবহার্য কোনো যানবাহন ছিল না — ছিল একমাত্র সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সরকারের ব্যবহারের গাড়ি। সেই ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেবার জন্য যুগপৎ কেটে দেওয়া হল অনেক পথ, উপড়ে ফেলা হল টেলিগ্রাফের খুঁটি, আক্রান্ত হল সরকারি অফিস ও থানা। সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেয় বিদ্রোহ দমনে। পুলিশের সঙ্গে যোগ দেয় সেনাবাহিনী, প্রস্তুত রাখা হয় বিমানবাহিনীকে, যাতে প্রয়োজনে বোমাবর্ষণ করে দমন করা যায় এই বিদ্রোহ। সরকারি আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য প্রতিটি অঞ্চলে গড়ে তোলা হয় বিদ্যুৎবাহিনী, যাদের হাতে অস্ত্র ছিল লাঠি, বড়জোর বর্শা ও দা। আন্দোলনের সময় ঐ বাহিনীর হাতে প্রায় ৯০টি সরকারি অফিস ও থানা ভস্মীভূত হয়, সরকারের হাতে ধ্বংস হয় প্রায় ২০০ কংগ্রেস ভবন ও শিবির। জারি হয় পাইকারি জরিমানা। সরকারের পুলিশ ও সেনা গ্রামাঞ্চলে অকথ্য অত্যাচার চালায়, খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য লুঠ করে। ধর্ষণ করে গ্রামের মহিলাদের। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বাংলায় অন্তত ৪৫জন প্রাণ হারান, যার অধিকাংশই মেদিনীপুরের — অন্যতম ছিলেন বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অপ্রতুলতা, নৌকা ও যানবাহন বঞ্চনার ফলশ্রুতি জীবিকাহীনতার সঙ্গে শাসকের অত্যাচারে মেদিনীপুরবাসী যখন নিষ্পেষিত তখন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো নেমে এল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘূর্ণিঝড়। ব্রিটিশ শাসকদের কাছে এই ঘূর্ণিঝড় এক দৈবাস্ত্রের মতো ছিল, যার সাহায্যে অবাধ্য প্রজাদের কিছু শিক্ষা দেওয়া যায়।

ঘূর্ণিঝড়

১৯৪২-এর ১৬ অক্টোবর ছিল দুর্গাপূজা — মহাসপ্তমী। ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলাতে সকাল থেকেই ঝোড়ো আবহাওয়া ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির বেগ বাড়ে, সেই সঙ্গে বাড়ে ঝড়ের তাণ্ডব। রাত ৮টা থেকে ২টো পর্যন্ত ঝড়ের রূপ ছিল প্রলয়ঙ্কর। পরদিন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে প্রচারিত সংবাদে ঐ ঝড়ের উল্লেখমাত্র ছিল না। ঐ দিনের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ৫ পৃষ্ঠার একটি সংবাদ ছিল যে পূর্বদিনের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুন দুর্গোৎসবের প্রথম দিনটি আনন্দমুখর হয়ে উঠতে পারে নি। তিন দিন পরে ২০ তারিখের ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশ পেল যে ঐ ঝড়ে বর্ধমান, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, কুষ্টিয়া ও রাজশাহী জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঐ সংবাদে ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুরের কোনো উল্লেখ ছিল না। ঐ দিনের স্টেটস্‌ম্যান পড়ে কেউ কিন্তু প্রশ্ন তোলে নি, একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় তার প্রবেশ পথ মেদিনীপুর আর ২৪ পরগনাতে উল্লেখযোগ্য কোনো কিছু না ঘটিয়ে কী করে সুদূর রাজশাহী জেলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সক্ষম হল।

আবহাওয়া বিভাগের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী সিয়াম উপসাগর অঞ্চলে একটি সামুদ্রিক ঝড় একটি স্টিমারকে ডুবিয়ে দিয়ে মালয় উপদ্বীপ অতিক্রম করে ১২ অক্টোবর মধ্য বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত হয়। সমুদ্র থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে এটি একটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আকার ধারণ করে। এর গতিপথ প্রথমে ছিল পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং ১৫ তারিখে এর অবস্থিতি ছিল কাঁথি থেকে আড়াইশো কিলোমিটার দক্ষিণে। ১৬ তারিখে ভোর বেলা এর তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং গতিপথ পরিবর্তন করে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। তখন তার দূরত্ব কাঁথি থেকে ৭০ কিলোমিটার। টেলিগ্রাম করে মেদিনীপুরের জেলাশাসককে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা জানানো হয়েছিল। তমলুকের মহকুমা শাসক কলকাতা থেকে তিনখানা টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন। এঁরা কেউই জনসাধারণকে সতর্ক করার কোনো ব্যবস্থাই নেন নি। সরকারি সেন্সর ব্যবস্থায় মেদিনীপুরের খবর অন্ধকারেই রয়ে গেল। ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সে জেলা থেকে বাইরের সব সাংবাদিকদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। সেখানে যে কিছু একটা ঘটেছে তা প্রথমে বাইরে জানা গেল যখন মহিষাদলের রাজা বাহাদুর ত্রাণকার্যে তাঁকে সহায়তা করার জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কাছে কয়েকজন অভিজ্ঞ সন্ন্যাসী কর্মী চেয়ে পাঠালেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল ভয়াবহ। রূপনারায়ণ নদীতে তাঁরা শতশত নরনারী ও গৃহপালিত পশুর শব ভেসে যেতে দেখেছিলেন। ঘূর্ণিঝড়ের পর তখন দু-সপ্তাহ কেটে গেছে। মানুষ ও পশুর শবের পচা দুর্গন্ধে তাঁদের পথ চলা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। মহিষাদল পৌঁছানোর পথে তাঁরা বহু জায়গায় স্তূপীকৃত মৃতদেহ তাঁদের হাতের লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। দু-সপ্তাহ ধরে মৃতদেহগুলো পড়ে থাকলেও কাছাকাছি কোনো শেয়াল, কুকুর বা শকুন তাঁরা দেখতে পান নি। এরাও সেদিনের ঘূর্ণিঝড়ে সবাই নিহত হয়েছিল। সমস্ত গ্রামের খাল বিল পুকুর, ডোবা, কুয়োর জল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও মৃতদেহ পচনের ফলে দূষিত হয়ে গিয়েছিল। পানীয় জল কোথাও ছিল না। পথে সর্বত্রই অর্ধনগ্ন কঙ্কালসার বন্যাক্লিষ্ট নরনারী সাহায্যের জন্য তাঁদের ঘিরে ধরছিল।

ঠিক একই সময়ে প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগের অ্যাডিশনাল কমিশনার বি আর সেন, আই সি এস., — ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণের জন্য কলকাতা থেকে মেদিনীপুর যান। ঝঞ্ঝাপীড়িত অঞ্চলে জনসাধারণের চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা এত কঠোর ছিল যে, যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিপত্র দেখানোর পর শ্রী সেনকে খেয়া নৌকায় উঠতে দেওয়া হয়। তিনি কলকাতা ফিরে যাবার পর নভেম্বরের ২ তারিখ বাংলা সরকার একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে মেদিনীপুরের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির উল্লেখ করেন এবং সেই বিবৃতি পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার ১৮ দিন পর। মেদিনীপুরের এই ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংবাদ প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ঐ সংবাদ জানতে পারলে নাকি জাপানের সুবিধা হয়ে যেত।

ঐ সময়ের মধ্যে সরকারিভাবে ত্রাণের কোনো ব্যবস্থাই হয় নি। শুধু তাই নয়, ঐ দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে বিপন্ন লোকেদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনার জন্য সান্ধ্যআইন ও নৌকা বঞ্চনা আইন সাময়িকভাবে শিথিল করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণের আবেদন তমলুকের মহকুমা শাসক অগ্রাহ্য করেন। মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির জনৈক কর্মী প্রয়োজনীয় ত্রাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে এলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসা যাবতীয় ত্রাণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বি আর সেনের সফরের পর বাংলার মন্ত্রিসভার তিন সদস্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নবাব খাজা হবিবুল্লাহ্ বাহাদুর ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধ্বস্ত অঞ্চল সফরে যান ফিরে এসে তাঁরা তাঁদের বিবৃতিতে বলেন, মেদিনীপুর জেলাতে ১০ হাজার এবং ২৪ পরগনায় ১ হাজার লোক নিহত হয়েছে। শতকরা ৭৫টি গৃহপালিত পশু বিনষ্ট হয়েছে। ত্রাণকার্যে সরকারি আধিকারিকদের সহানুভূতিহীনতা, ঔদাসীন্য ও উদ্ধত আচরণের প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। বি আর সেনের সফরের আগে এঁরাও সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন।

ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের পরও প্রায় ১৫ দিন বাংলার গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট দার্জিলিঙে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন। বাংলার ব্রিটিশ রাজপুরুষদের আচরণ এমনই দৃষ্টিকটু পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে গভর্নর জেনারেল লিনলিথগো এই

বিপর্যয়ের সংবাদ দিল্লি নভেম্বরের তিন তারিখের সংবাদপত্র থেকে জানতে পারেন। দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে বাংলার গভর্নর বিমান যোগে বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে যান। ফিরে এসে জানান, বিমান থেকে তিনি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোনো জীবিত প্রাণী, মানুষ অথবা গৃহপালিত পশু দেখতে পান নি। সমস্ত শস্যক্ষেত্র ও গাছপালা ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে বহু কুটীর, পাকা বাড়ির ছাদও উড়ে গেছে।

নভেম্বর মাসে তিন মন্ত্রীর মেদিনীপুর সফরের পর ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে জনসাধারণ কিছুটা ধারণা করতে পেরেছিল কিন্তু তা ছিল হিমশৈলের শিখর মাত্র যা অপ্রকাশিত অংশের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। প্রকৃত সংবাদ জানার জন্য সরকারের ওপর জনমতের চাপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এরপরই কঠোর বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করে সাংবাদিক ও ত্রাণসংগঠনগুলিকে অনুমতিপত্র নিয়ে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে কাজ করতে দেওয়া হয়।

বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ত্রাণসংগঠনের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত কাঁথি ও তমলুক মহকুমার দুর্গত জনসাধারণের কাছ থেকে জানতে পারেন, ১৬ অক্টোবর ভোর থেকেই আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি এবং বাতাসের বেগ বাড়তে থাকে। বেলা দুটো নাগাদ অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রায় ২০ ফুট উঁচু তিনটি সামুদ্রিক ঢেউ উপকূলের গ্রামগুলির ওপর আছড়ে পড়ে। ঢেউয়ের তোড়ে গ্রামের নরনারী, গৃহপালিত পশু খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। ঐ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের আক্রমণ এমনই আকস্মিক ছিল যে গ্রামের অধিবাসীরা পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবার অবকাশ পান নি। যাঁরা গাছের ডালে অথবা চালা ঘরের মাথায় আশ্রয় নিয়েছিল, তাঁদের অধিকাংশই সেই গাছ আর চালাঘরসহ ভেসে গিয়েছিল পরপর তিনটি সামুদ্রিক ঢেউয়ের তোড়ে। অবিশ্রান্ত তুমুল বৃষ্টি ও প্রবল ঝড় চলেছিল মধ্যরাত্রি পেরিয়েও আরো কয়েক ঘন্টা। কাঁথি ও তমলুকের যে অঞ্চ দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল, সেখানে অতি অল্পজনই অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছিলেন। তমলুক ও কাঁথির উপকূল ভাগের জমি অত্যন্ত নিচু, নদীর পাড় ধরে মাটির উঁচু বাঁধ দিয়ে সেখানকার কৃষি জমিকে সমুদ্রের নোনা জল থেকে রক্ষা করা হয়। সেই মাটির বাঁধ জমিকে জোয়ারের হাত থেকে বাঁচাতে পারত। ২০ ফুট উঁচু সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে সেই বাঁধের প্রায় ১৮০ কিলোমিটার ধ্বংস হয়ে যায়। বাঁধের পেছনের ৮,৪০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল প্লাবিত হয়ে প্রায় ৭৫০০ গ্রাম ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাঁথি ও তমলুকের ৭৮৬টি গ্রামের কোনো চিহ্ন ছিল না। ৫,২৭,০০০ বসতবাড়ি ও প্রায় ২০০০ বিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। শস্য নষ্ট হয়েছিল তখনকার দিনের ১১ কোটি টাকার। প্রায় ২৫ লক্ষ বাঙালির বাড়িঘর, সম্পত্তি ও জীবিকা ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ঘূর্ণিঝড়ের পর সরকারি প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে নিহতের সংখ্যা মেদিনীপুরে ১০,০০০ ও চব্বিশ পরগনাতে ১,০০০ বলা হয়। সরকারের পরবর্তী হিসাবে মেদিনীপুরে নিহত ১৪,৪৪৩ জন, এর মধ্যে ১১ হাজারের মৃত্যু ঘটে শুধু কাঁথি মহকুমায়। মেদিনীপুরে ১,৮০,০০০ চাষের বলদ, দুগ্ধবতী গাভী জলে ডুবে মারা গিয়েছিল। বেসরকারি হিসাবে অবশ্য মৃতের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার।

মেদিনীপুরের ব্রিটিশ শাসকেরা সময়মতো কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলে অন্তত কিছু লোকের প্রাণরক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু সে ব্যাপারে তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। বরং সেদিন নদীর উঁচু বাঁধে বা অন্য কোনো জায়গায় আশ্রয় নিয়ে যে সমস্ত হতভাগ্য শুধুমাত্র নিজের প্রাণটুকু হাতে নিয়ে বসেছিলেন তাঁদের কাছে সামান্যতম সহায়তা পৌঁছে দিতে তাঁদের ছিল তীব্র অনীহা। দুর্গতরাই সেদিন একে অন্যকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

১৯৩৫-এ বিহারের ভূমিকম্পের পর ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে ত্রাণকার্য সংগঠনের ভার দেওয়া হয়েছিল। এবারও তেমনই শরৎচন্দ্র বসুকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে ত্রাণকার্যে নেতৃত্ব দেবার দাবি উঠেছিল। সরকার কর্ণপাত করে নি। ভারতরক্ষা আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে সমগ্র মেদিনীপুর জেলা একটি কারাগারে পরিণত হয়েছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে নলিনাক্ষ সান্যাল অভিযোগ করেছিলেন, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের বহুদিন পরও লোক সরকারি কর্মচারিদের ছাড়পত্র ছাড়া কাঁথি থেকে অন্যত্র যেতে পারত না। এমন কি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদেরও তাঁদের নির্বাচক মণ্ডলীর নিকট যেতে দেওয়া হয় নি — তাঁরা দুর্গতদের কোনো সাহায্য করতে পারেন নি। যানবাহনের অভাবের ফলে অন্য জেলা থেকে কোনো জিনিসের আমদানি ছিল না। টাকা থাকলেও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মেদিনীপুরে সেদিন ছিল অলভ্য। গাড়ি বঞ্চনা, নৌকা বঞ্চনা, সাইকেল বঞ্চনা নীতিতে জাপানিরা বঞ্চিত হয় নি, বঞ্চিত হয়েছিল সেই হতভাগ্যরাই, যারা একদিন এইসব যানবাহনের মালিক ছিল।

অবশেষে ঘূর্ণিঝড়ের ২৪ দিন পর, ৯ নভেম্বর মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বাংলোতে বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এক সভা আহ্বান করেন। এই ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট সেদিন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি, হিন্দু মহাসভা ও নববিধান রিলিফ মিশনকে মেদিনীপুরের বিভিন্ন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সেবাকর্মের অনুমতি দেন। নৌকা ব্যবহারের অনুমতির অভাবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সংগৃহীত সমস্ত ত্রাণসামগ্রী এতদিন গুদামে তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল, দুর্গতদের কাছে পৌঁছতে পারে নি।

বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মীরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে দেখতে

পান যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা বন্যার জলে ভিজে পচে যাওয়া কালো রঙের চাল সেদ্ধ করে খাচ্ছেন, যা থেকে নির্গত হয় পচাগলা মৃতদেহের গন্ধ। শিশুরা অধিকাংশই মৃত, উপযুক্ত পানীয় জলের অভাবে সর্বত্রই আন্ত্রিক রোগ। ন্যূনতম গাত্রাবরণের অভাবে মহিলারা ত্রাণকেন্দ্রে আসতে পারছেন না।

বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত অনুমতি ছিল শর্তকন্টকিত, যার ফলে তারা স্বাধীনভাবে সেবাকার্য চালাতে পারছিল না। সরকার চাইছিল, এরা যেন তাদের সংগৃহীত সমস্ত নগদ অর্থ গভর্নরের রিলিফ ফান্ডে জমা দেয়। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই নির্দেশ মানতে অনিচ্ছুক ছিল তাদের সেবাকার্য বন্ধ করে চলে যাবার জন্য পরোক্ষে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। সরকারের পক্ষ থেকেও অবশ্য ত্রাণের ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত বিলম্বিত ও দীর্ঘসূত্র। সরকারের নির্দেশের মধ্যে ছিল কোনো পরিবারকে এক মাসের বেশি বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হবে না। গৃহ নির্মাণের জন্য কোনো অবস্থাতেই ৬০ টাকার বেশি দেওয়া হবে না, কোনো উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে কোনো ত্রাণসাহায্য দেওয়া হবে না ইত্যাদি।

১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ত্রাণ কার্যে মেদিনীপুরের জেলাশাসকের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়। জেলাশাসক মন্তব্য করেছিলেন, মেদিনীপুরের বিদ্রোহীগণ যে সমস্ত রাজনৈতিক দুষ্কর্মের প্রস্তাব দিয়েছে, তার জন্য এই দুর্ভোগ ভুগতেই হবে। এই দুর্ভোগ বাস্তব পক্ষে সরকারের তরফ থেকে প্রতিশোধমূলক শাস্তি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জেলাশাসককে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলেন, 'জনসাধারণের প্রতি তাঁর পূর্বপোষিত বিদ্বেষের ফলেই দুর্গতদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের যে কর্তব্য পদাধিকার বলে তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছে, সেই কর্তব্য তিনি সম্পন্ন করেন নি।' ... 'রাজনৈতিক দুষ্কর্মের কথা স্মরণ রেখে এই সব বন্যাবিধ্বস্ত জনসাধারণকে কোনোরূপ সরকারি সাহায্য তো দেওয়া উচিত নয়, এমনকি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।' বলে জেলাশাসক তাঁর রিপোর্টে যে মন্তব্য করেন, তাতেই তাঁর মনোবৃত্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। বাস্তবে তখন স্থানীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ঘূর্ণিঝড়কে বিদ্রোহ দমন করার একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতির পরে ঐ অধিবেশনেই অন্যান্য অনেক সদস্য মন্তব্য করেন যে কংগ্রেসের আন্দোলন প্রথমে অহিংসই ছিল পরে সরকারের কঠোর দমননীতির প্রয়োগের ফলেই তা উগ্ররূপ ধারণ করে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হওয়ার বহু পূর্বেই সামরিক প্রয়োজনে নৌকা ও সাইকেল বাজেয়াপ্ত করাতে লোকের মনে সরকারের প্রতি ক্ষোভ সঞ্চিত ছিল। আন্দোলন দমনের নামে পুলিশ ও সৈন্যরা নিদারুণ অত্যাচার চালায়, বহুলোক গুলিতে নিহত হন, তাঁদের ঘর বাড়ি লুণ্ঠন করে অগ্নিসংযোগ করা হয় — মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্ট করা হয়। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাষ পাওয়ার পরও সেখানকার কর্তৃপক্ষ কোনো সতর্কতা অবলম্বন করেন নি। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হলেও অকারণে সেই খবর গোপন করে রাখা হয়েছিল, এমন কি বাংলা প্রদেশের মন্ত্রিসভাও সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল। রাজনৈতিক কারণেই জেলা কর্তৃপক্ষ ত্রাণকার্যে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ দেখান নি।

ব্যবস্থাপক সভায় এই সমালোচনার পর ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে ও পরে মেদিনীপুরের রাজপুরুষদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের দাবি ওঠে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবুল কাশেম ফজলুল হক সে দাবি মৌখিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয় নি। কারণ মন্ত্রিসভার কোনো নিজস্ব ক্ষমতা ছিল না, সেটা ছিল শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদের কুক্ষিগত।

ঘূর্ণিঝড়ে কয়েক হাজারের মৃত্যু হয়েছিল, বাকি কয়েক হাজার নিষেধাজ্ঞার লৌহ যবনিকার অন্তরালে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ত্রাণ না পেয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিল। ব্রিটিশ সরকার সেদিন কাঁথি ও তমলুক মহকুমাকে শ্মশানে নয়, একটি বিরাট ভাগাড়ে পরিণত করেছিল। শ্মশানে তো মৃতের সৎকার উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গেই হয়ে থাকে!

তিনজন জেলাশাসকের মৃত্যুর প্রতিশোধ হয়েছিল ৫০ হাজার দুর্গত নরনারী, শিশুর প্রাণ নিয়ে।

দুর্ভিক্ষ

ঘূর্ণিঝড়ের হাত ধরে আসে দুর্ভিক্ষ, যেমন এসেছিল বঙ্গোপসাগরে প্রথম নথিবদ্ধ ১৭৩৭-এর কলকাতা ঘূর্ণিঝড়ের পর। ঘূর্ণিঝড়ের সময় নোনা জলের সামুদ্রিক ঢেউ একটা বিরাট অঞ্চলের সমস্ত পানীয় জলকে দূষিত করে এবং সমস্ত জমিকে কয়েক বৎসরের জন্য চাষের অযোগ্য করে দিয়ে যায়। আশ্বিনের ঝড়ে আউশের ফসল ক্ষেতেই নষ্ট হয়, পরবর্তী আমনের চাষও সম্ভব হয় না। তবে মেদিনীপুরের ৪২-এর ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী যে খাদ্যসঙ্কট, পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে যা বাংলা সাহিত্যে খ্যাত রয়েছে, তার জন্য প্রকৃতি যতটুকু দায়ী ছিল, তার চেয়ে বেশি দায়ী ছিল মনুষ্যসৃষ্ট অব্যবস্থা।

শাসকদের তৈরি দুর্ভিক্ষের পূর্ববর্তী উদাহরণ এই বাংলাতেই রয়ে গেছে ১৬৬২ সালের ঢাকার দুর্ভিক্ষে। ঢাকার মোগল শাসনকর্তা মীর জুমলা ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ৩০ হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে আহোম রাজ বিশ্বসিংহকে আক্রমণ করার জন্য কামরূপের উদ্দেশে রওনা হন। তিনি তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য দীর্ঘদিনের প্রয়োজনীয় রসদ ঢাকা থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁর পদাতিকদের মধ্যে বহু স্থানীয় কৃষককেও জোর করে ঢোকানো হয়েছিল। ফলে শুধুমাত্র ঢাকাতেই স্থানীয় ভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ২৮০

বছর পর এমনই আরেকটি প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির অব্যবস্থায় বাংলায় অনাহারে মৃত্যু হয়েছিল কয়েক লক্ষ নরনারীর। এই দুর্ভিক্ষের বীজ বপন করা হয়েছিল ৪২-এর এপ্রিলে চাল বঞ্চনা নীতির মাধ্যমে। চাল উৎপাদনে মেদিনীপুর ছিল উদ্বৃত্ত জেলা। সেখানে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সরিয়ে দিয়ে সরকার তাদের নিযুক্ত দালালদের মাধ্যমে, অনেক সময় বলপ্রয়োগ করে সামরিক প্রয়োজনে বাজার চলতি দামের চেয়ে কম দামে ধান-চাল সংগ্রহ করে নেয়। ফলে আগস্ট আন্দোলনের পূর্বেই সেখানে খাদ্যাভাব দেখা দেয়।

অনাহারে মৃত্যুর প্রথম ঘটনা ঘটে ঘূর্ণিঝড়ের পরে, যখন আউস ও আমন দুটি ফসলই নষ্ট হয়ে গেছে। প্রথম বলি ছিল তাঁরাই যাঁদের জমি অল্প টাকার বিনিময়ে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল বিমানঘাঁটি ও সেনাছাউনি নির্মাণের প্রয়োজনে। আর ছিলেন সেই হতভাগ্যরা, নৌকা-বঞ্চনা নীতির নামে যাঁদের রুজি রোজগারের সব রকম পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

মেদিনীপুরে ঘূর্ণিঝড়ের পরে দুর্ভিক্ষের শুরুতে, কলকাতা থেকে ২০ লক্ষ দুর্গতের জন্য যে পরিমাণ চাল পাঠানো হয়েছিল তা ছিল বৎসরের প্রথমদিকে চাল বঞ্চনা নীতি অনুযায়ী সেই জেলা থেকেই সংগৃহীত মোট চালের এক তৃতীয়াংশেরও কম। প্রয়োজনের তুলনায় এই পরিমাণ ছিল অত্যল্প। সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে ব্রিটিশ শাসকের কাছে মেদিনীপুরের উপকূল ছিল জাপানিদের মূল ভূখণ্ডে অবতরণের সম্ভাব্যতম অঞ্চল। সেখানে ন্যূনতম ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়ে একটি কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ছিল সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাতে জাপানিদের বঞ্চনা করা ছাড়াও বিদ্রোহীদের কিছু শিক্ষা দেওয়া যেত।

মার্চ মাসে চট্টগ্রাম এবং ডিসেম্বরে কলকাতার ওপর জাপানি বোমারু বিমানের আক্রমণ ব্রিটিশ শাসকদের কিছুটা দিশেহারা করে দেয়। প্রয়োজনে তারা উপকূল অঞ্চল জাপানিদের হাতে ছেড়ে দিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য কলকাতাকে দখলে রাখা অত্যন্ত জরুরি। সেনাবাহিনীর রসদ ও সরকারি খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য উপকূলবর্তী অঞ্চলেই প্রথম নজর পড়ল। ৪৩-এর এপ্রিলে চট্টগ্রামের জেলাশাসক পুলিশের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করেন এবং একজন মজুতদারের কারাবাস হয়। এর ফলে বাকি সবাই মজুত শস্য সরিয়ে দেয়। অনুরূপ ঘটনার উদাহরণ ছিল আরো বহু জেলা শহরে। ফলে বাংলার মফস্বল অঞ্চলের খোলা বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে যায়। জাপানিদের হাতে ব্রহ্মদেশের পতনের পর সেখান থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। তা ছিল বাংলার বাৎসরিক চাহিদার প্রায় ৬ শতাংশ। এই ঘাটতি পূরণের কোনো চিন্তাই করা হয় নি। এমন কি এই সময়ে বাংলায় উৎপন্ন প্রচুর উন্নত মানের চাল দক্ষিণ ভারতের প্রদেশগুলিতে চালান হয়ে যায়। ২৪ ডিসেম্বর চতুর্থবার কলকাতার ওপর বোমা বর্ষণের পর সরবরাহ বিভাগ হঠাৎ কলকাতার সব চাল ব্যবসায়ীর গুদাম দখল করে নেয়। ফলে মফস্বল থেকে সোজা পথে কলকাতায় চাল আসা বন্ধ হয়ে যায়। চালের বাজারে দেখা দেয় নতুন পদ্ধতি মজুতদারি ও কালোবাজারি।

কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে প্রতিরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত শিল্পগুলির অবাধ উৎপাদন সুনিশ্চিত করার জন্য সরকার বেঙ্গল চেম্বার অভ কমার্সকে তার অন্তর্ভুক্ত ১০ লক্ষেরও বেশি কর্মীর খাদ্যের যোগান অব্যাহত রাখার উদ্দেশে পাইকারি বাজার থেকে কাদ্যশস্য সংগ্রহের অনুমতি দেয়। সরকারি ঠিকেদারির সুবাদে এই শিল্পসংস্থাগুলির অর্থের অনটন ছিল না। তারা অনেক বেশি দাম দিয়ে কালোবাজারিদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে নিতে থাকে। সরকার নিযুক্ত দালাল ইস্পাহানির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তার সংস্থা পুলিশের সাহায্যে উৎপাদকের কাছ থেকে কম দামে চাল সংগ্রহ করে কালোবাজারি দামে এই শি সংস্থাগুলিকে সরবরাহ করেছে।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে ভোগ্যপণ্যের দাম ক্রমশই বাড়ছিল অথচ গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের সেই বর্ধিত দাম দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের ক্ষমতা ছিল না। মল্যবৃদ্ধির চাপে, নগদ অর্থের প্রয়োজনে ৪৩-এর প্রথম ভাগেই চাল উৎপাদনকারীরা তাঁদের সঞ্চিত খাদ্যশস্য কালোবাজারিদের কাছে বিক্রি করে দেন। নতুন ফসল ঘরে ওঠার আগেই ছোট চাষীরা অনশনের সম্মুখীন হয়। সমগ্র বাংলায় স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী চালের জোগান অব্যাহত রেখে মূল্যমান স্থিতিশীল রাখতে সরকার কোন উদ্যোগই নেয় নি। সরকারের চিন্তা ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক — মফস্বলের সাধারণ অধিবাসীদের কথা চিন্তা করার মানসিকতা তখন তাদের ছিল না।

নৌকা বঞ্চনা, যানবাহন বঞ্চনা, সাইকেল বঞ্চনা, জমি অধিগ্রহণ ইত্যাদির ফলে কয়েক লক্ষ বাঙালি কর্মহীন নিঃস্বা হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ২৭ লক্ষ ছিল ক্ষেত মজুর, ১৫ লক্ষ কারিগর ২৫ হাজার বিদ্যালয় শিক্ষক। ৪৩-এ চাল দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হয়ে পড়লে এঁরা প্রথমে তাঁদের সঞ্চিত অল্পসল্প সোনা রূপার গহনা, পূজার বাসনসহ গৃহদেবতার অষ্ট ধাতুর বিগ্রহ, রান্নার বাসন, কাঁসার পাত্র টিনের চাল বিক্রি করে দেন। এই বিক্রির টাকা যখন শেষ হয়ে গেছে তখন টান পড়েছে দুধের গরু, চাষের বলদ আর ভিটেমাটিতে। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের সমীক্ষায় জানা যায়, ১৩৫০ বঙ্গাব্দে ৯,২৫,০০০ পরিবার তাদের ধানী জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। এই জমির পরিমাণ ছিল সমগ্র বাংলার চাষযোগ্য জমির প্রায় ১৫ শতাংশ। তার মধ্যে পৌনে তিন লক্ষ পরিবার বিক্রি করেছিল সম্পূর্ণ জমিটাই। এইউ টাকাও যখন শেষ হল, তখন সামনে একটি পথই খোলা ছিল, অনশনে তিলে তিলে মৃত্যু।

তেতাল্লিশের মন্বন্তরে মৃত্যু শুরু হয় বাংলার দুটি প্রান্ত থেকে। পশ্চিমে ঘূর্ণিঝড় পীড়িত মেদিনীপুর ও পূর্বে বোমাবিধ্বস্ত চট্টগ্রাম। জুন মাসে চট্টগ্রাম জুড়ে অনাহারে মৃত্যুর খবর আসতে থাকে। সেখান থেকে জানুয়ারি মাসেই ত্রাণের আবেদন পাঠানো হয়েছিল, কলকাতা থেকে কোনো সাড়া মেলে নি। এরপর অনাহারের সংবাদ আসতে থাকে নোয়াখালি, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান এবং রংপুর জেলা থেকে। ক্রমশ তা সম্পূর্ণ বাংলাকেই গ্রাস করে। এই সময় বহু ক্ষুদ্রচাষী ময়মনসিংহ থেকে আসাম চলে যান, সেখানে কোনো খাদ্যসমস্যা ছিল না।

অনাহারে ব্যাপক মৃত্যুসংবাদ আসার পর ৪৩-এর জুলাই মাসে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বাংলা ত্রাণ সমিতি গঠে ওঠে। দুর্ভিক্ষের চরম পর্যায়ে কলকাতা ও ২৫টি জেলায় এই ত্রাণ সমিতি তিন লক্ষ পরিবারকে খাদ্য সরবরাহ করেছিল।

৪৩-এর মার্চে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন ঢাকার নবাব খাজা নাজিমুদ্দিন ও অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী হাসান শহিদ সুরাবর্দি। এই সরকারও একটি ত্রাণব্যবস্থা সংগঠন করে। এই ত্রাণব্যবস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে রিলিফ কমিশনার গোপনে নতুন গভর্নর জেনারেল ওয়াভেলকে জানান, বাংলা প্রদেশের প্রশাসন ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি ও প্রতারণায় পূর্ণ। চুরি ও আত্মসাৎ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যা ত্রাণব্যবস্থাকে অকার্যকর করে ফেলেছে। ওয়াভেল এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারিদের বিশেষ আদালতে বিচার করে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন — যা কোনোদিনই কার্যকর হয় নি।

কিন্তু কেন এই দুর্ভিক্ষ, যাতে লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর অনাহারে মৃত্যু হল? এঁদের একটি বড় অংশ নিযুক্ত ছিল ক্ষেতে খাদ্যশস্য উৎপাদনেই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী এর কারণ দর্শিয়ে ছিলেন বারো দফায়। প্রথম, ১৯৪২-এ আউশ ফলন ভাল হয় নি, দ্বিতীয়, ৪২-৪৩ অব্দে আমনের ফলন কম হয়েছে, তৃতীয় মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনায় ঘূর্ণিঝড় হওয়াতে উৎপাদন কম হয়েছে, চতুর্থ, কীটের উপদ্রবে ফসল নষ্ট হয়েছে, পঞ্চম, নৌকা নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে, ষষ্ঠ, সমুদ্রকূল থেকে লোক অপসারণের জন্য উৎপাদনের ক্ষতি হয়েছে, সপ্তম, ব্রহ্ম ও আরাকান থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীরা ভিড় বাড়িয়েছে, অষ্টম, শিল্পকেন্দ্রগুলিতে অন্য প্রদেশ থেকে শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, নবম, ব্রহ্মদেশ থেকে চাল আমদানি বন্ধ হওয়ার ঘাটতি পূরণ হয় নি, দশম, অনেক বিমানঘাঁটি তৈরি হওয়াতে সেখানে চাষ হয় নি, একাদশ, সামরিক লোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়াতে খাদ্যশস্য বেশি খরচ হয়েছে, দ্বাদশ, অন্যান্য প্রদেশ থেকে আমদানি কম হয়েছে।

৪৩-এর ৪ঠা নভেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দুর্ভিক্ষ নিয়ে আলোচনাতে মুদ্রাস্ফীতিকে দুর্ভিক্ষের অন্যতম মূল কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। সুরাবর্দির বারো দফার মধ্যে এর উল্লেখ না থাকাতে ব্যবস্থাপক সভায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার কঠোর সমালোচনা করে বলেন সরবরাহ মন্ত্রী গৌণ কারণগুলির ওপর জোর দিয়ে আসল কারণ চেপে গেছেন।

এই দুর্ভিক্ষটি যে সম্পূর্ণ মনুষ্যসৃষ্ট এ সম্পর্কে প্রথম মন্তব্য করেন স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ৪৩-এর ২৩ সেপ্টেম্বরে। তার আগে জুলাই মাসেই সম্পাদক আয়ান স্মিথ সরকারের খাদ্যনীতিকে খোলাখুলি আক্রমণ করে দ্রুত ত্রাণব্যবস্থার দাবি জানান।

দুর্ভিক্ষ নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি শুধু বাংলায় নয় দিল্লিতেও জোরালো হয়ে ওঠে। অনেক টানাপোড়েনের পর ৪৪-এর মাঝামাঝি ফেমিন এনকোয়ারি কমিশন কাজ শুরু করে। সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ হয়েছিল গোপনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে। ১৯৪৫-এ দিল্লি থেকে প্রকাশিত রিপোর্ট অন বেঙ্গলে বাংলা সরকারের ধারাবাহিকভাবে গৃহীত যে সমস্ত নীতি ও সিদ্ধান্ত দুর্ভিক্ষকে ত্বরান্বিত ও ত্রাণকার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল সেগুলিকে তুলে ধরা হয় এবং নাম উল্লেখ না করে ঐ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মন্ত্রক ও কর্মচারিদের কঠোর সমালোচনা করা হয়। ঐ রিপোর্টের ফলশ্রুতি, দুর্ভিক্ষটি মনুষ্যসৃষ্ট ছিল তা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া।

বাংলা ১৩৫০-এর এই মন্বন্তর যুগসঞ্চিত বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিয়ে যায়। ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত যা করতে পারে নি তা পেরেছিল এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ। চাল গ্রামেই সঞ্চিত ছিল জমিদার আর সম্পন্ন চাষির ভাণ্ডারে। ভয় এবং লোভ তাদের প্ররোচিত করেছিল তাদের ওপর নির্ভরশীল ক্ষুধার্ত ক্ষেতমজুর, জেলে, কামার, কুমোর, তাঁতীদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে। ভয়, সরকার টের পেলে জোর করে সব চাল কেড়ে নেবে সামরিক প্রয়োজনে। লোভ, এই মুদ্রাস্ফীতির বাজারে কালোবাজারির কাছে চাল বিক্রি করতে পারলে দুটো পয়সা বেশি ঘরে আসবে। মূল্যবোধের এই অবক্ষয় কয়েকমাস আগেও ঝঞ্ঝাপীড়িত মেদিনীপুরে অকল্পনীয় ছিল। তখন এক দুর্গত আরেক দুর্গতকে সাহায্য করেত ছুটে গিয়েছিল। একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির মতো ব্রিটিশরাজের সৃষ্টি এই দুর্ভিক্ষের দান মূল্যবোধের অবক্ষয় অকস্মাৎ সমগ্র বাংলাকে গ্রাস করে ফেলেছিল।

ঘূর্ণিঝড়ের সময় গৃহীত নীতি কোনো উপার্জনক্ষম পুরুষকে ত্রাণ দেওয়া হবে না, বহু পুরুষকে বাধ্য করেছিল তাদের সংসার পেছনে ফেলে রেখে রুজি ও খাদ্যের সন্ধানে শহরের দিকে পাড়ি দিতে। পেছনে ফেলে যাওয়া শিশু-সন্তানেরা অধিকাংশই বেশি দিন বাঁচে নি, স্বামী পরিত্যক্তা অনেকেরই শেষ আশ্রয় হয়েছিল পতিতালয়ে। যাঁরা পারিবারিক মায়া মমতার বন্ধন

ছিঁড়তে পারেন নি তাঁরা সবাই মিলে খাদ্যের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছিলেন, একটি বড় অংশ ট্রেনে চড়ে কলকাতার দিকে। পথে পথে তাঁরা ফ্যান ভিক্ষা করেছেন, আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে খেয়েছেন, আর ফুটপাথে শুয়ে সামনের দোকানের শো-কেসে থরে থরে সাজানো নাম না জানা মিষ্টির দিকে তাকিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সারা বাংলায় এই দুর্ভিক্ষের বলি ফেমিন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী দশ থেকে কুড়ি লক্ষ। অন্য একটি বেসরকারি হিসেবে ৩৫ লক্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ছয় বৎসরে সমগ্র ইয়োরোপের কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে প্রাণ দিয়েছিল ৬০ লক্ষ ইহুদি নরনারী শিশুরা আর মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় আর ব্রিটিশ অপশাসন প্রসূত দুর্ভিক্ষের বলি হয়েছিল মোট সাড়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষ প্রাণ। তীব্রতা কোনটার বেশি ছিল? আইখম্যানকে ধরে এনে বিচার করেছিল ইজরায়েল। কিন্তু এই পোড়া দেশে এই হতভাগ্য কয়েক কয়েক লক্ষ জীবিত অবস্থাতেও কোনো বিচার পায় নি, মরার পরেও না।

কোনো রাজপুরুষের শাস্তি হয় নি। অবাধ্য প্রজাদের একটু শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল মাত্র।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। মুক্তির সংগ্রামে ভারত। তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৬।

২। পলগ্রীনো। আধুনিক বাংলা সমৃদ্ধি ও দারিদ্র। দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-৪৪। অনুবাদ শুভেন্দু দাশগুপ্ত ও অন্যান্য। কে.পি.বাগচি অ্যান্ড কোং, ১৯৯৭।

৩। সুকুমার রায় ও অজিত বসুমল্লিক সম্পাদিত, আগস্ট সংগ্রাম ও মেদিনীপুরের জাতীয় সরকার, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি।

৪। এ. কে. সেনশর্মা, দ্য গ্রেট বেঙ্গল সাইক্লোন অব সেভেন্টিন থার্টি সেভেন, ওয়েদার মার্চ ১৯৯৪। রয়েল সেটিওরোলজিক্যাল সোসাইটি।

৫। রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য, এন অ্যাডভান্সড্ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ম্যাকমিলান ১৯৪০।

৬। ভবানী সেন, মুক্তির পথে বাংলা, কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৫।

৭। চিত্তপ্রসাদ, হাংরি বেঙ্গল ১৯৪৫।

৮। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাশের মন্বন্তর, বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৯৫২।

৯। ঘূর্ণিঝড় ও দুর্ভিক্ষের সমসাময়িক প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও মাসিক ব-সুমতীতে প্রকাশিত সাময়িক প্রসঙ্গ।

১০। বিভিন্ন তারিখের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা।

রামকৃষ্ণ অন্য চোখে

রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়

মূল্য - ১০০ টাকা

বইমেলায় উৎস মানুষের স্টলে পাওয়া যাবে

বিজ্ঞানের খণ্ডদৃষ্টি

সমর বাগচী

প্রাক কথন

আমার এই লেখা হয়ত বিতর্ক সৃষ্টি করবে। প্রথমেই বলে রাখি যে আমি যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি। প্রকৃতির রহস্যকে জানার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। মানুষকে সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা দেবার অপার ক্ষমতা আছে বিজ্ঞানের। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য যে জ্ঞান তা বিজ্ঞানই দিতে পারে।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লব শুরু হয় ১৫-১৬ শতাব্দীতে। তা পূর্ণ রূপ গ্রহণ করে ১৭ শতাব্দীতে। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম দেন গ্যালিলিও যখন তিনি প্রকৃতির নিয়ম অনুসন্ধানে পরীক্ষা এবং গণিতের প্রয়োগ করেন। কিন্তু সেই ১৫-১৬ শতাব্দীতে শুরু হয় ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং ১৮ শতাব্দীর মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন। ১৮ শতাব্দীর মধ্যভাগে শুরু হয়ে ১৯ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে সম্পন্ন হল শিল্প বিপ্লব এবং শিল্প পুঁজিবাদের আবির্ভাব। শিল্প সমাজের উদ্ভব হল। উৎপাদন শুরু হল বাজারের জন্য, লাভের জন্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য দ্রুত অগ্রগতি শুরু হল। ধীরে ধীরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে 'হাইজ্যাক' করল পুঁজি ও ভোগবাদ। বিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্যে যে বিপদ লুকিয়ে ছিল তার ভয়ঙ্কর প্রকাশ আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের ঐ পদ্ধতি এবং তার থেকে উদ্ভূত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা।

খণ্ডদৃষ্টির আবির্ভাব

'রিডাকসনিস্ট এপিস্টোমোলজি'-এর বাংলা আমি করেছি বিজ্ঞানের খণ্ডদৃষ্টি। এই বিজ্ঞানের জনক চারজন — গ্যালিলিও, ফ্রান্সিস বেকন, রণে দেকার্ত এবং নিউটন। বেকন ও দেকার্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্মদাতা। বেকনের যে পদ্ধতি — তার ছায়া আমরা ১২ শতাব্দীর অক্সফোর্ডের পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্ব রজার গ্রসেটেস্টের লেখার মধ্যে পাই। দেকার্তের পদ্ধতিরও ছায়া আছে গ্রসেটেস্টের লেখার মধ্যে। দেকার্তের যে পদ্ধতি তাতে বলা হচ্ছে প্রকৃতিকে বা কোন ঘটনাকে (phenomenon) বুঝতে হলে তাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছোট করে দেখতে হবে।

গ্রসেটেস্টে বলছেন, "Science began with man's experience of phenomenon, breaking them into component parts or principles (Cartesian!), then

forming a hypothesis which has to be tested (Bacon) and verified or disproved by further observation (falsification!)." বিজ্ঞান করতে গেলে এই পদ্ধতি অনিবার্য। কিন্তু এই পদ্ধতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে খণ্ডদৃষ্টির বিপদ। ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখতে গিয়ে সমগ্র দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। এই পদ্ধতির বিপদ দার্শনিরা ১৮ শতাব্দীতেই বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯ শতকের দার্শনিক কার্ল মার্কসের সহযোগী ফ্রীডরীখ এঙ্গেলস 'Anti Duhring' গ্রন্থে লিখছেন, "The analysis of Nature into its constituent parts were the fundamental conditions for the gigantic studies made in our knowledge of Nature during the last 400 years. But the method of investigation has also left us a legacy of the habit of observing natural objects & natural processes in thier isolation, detected from vast interconnection of things."

এই যে সাবধানবাণী তার দিকে নজর দেননি বিজ্ঞানীরা। একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান কোটি কোটি ডলার খরচা করছে একটি আবিষ্কারের জন্য। তারা চায় সেই আবিষ্কারকে প্রযুক্তিতে প্রয়োগ করে কোটি কোটি টাকা লাভ করতে। সেই প্রযুক্তির প্রয়োগ ভবিষ্যতে প্রকৃতিতে কী বিপদ আনতে পারে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার আগেই সামান্য কিছু trial-এর পর তার ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতকগুলি উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব।

ইঞ্জিনীয়ারিং খণ্ডদৃষ্টি

প্রতিটি নদীর একটি বাস্তুতান্ত্রিক ক্রিয়া (ecological function) আছে তার উৎস থেকে সমুদ্রে যাত্রা পর্যন্ত। সেসব না বুঝে আমরা নদীতে বাঁধ দিই বিদ্যুৎ শক্তি, সেচের জল বা বন্যা নিরোধের জন্য। ভারতের লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি লবণাক্ত এবং জলমগ্ন হয়েছে ভুল চাষ ব্যবস্থার জন্য। আজ পশ্চিমী দুনিয়ায় ৫০০টির বেশি বাঁধ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথত ১৯২২ সালে 'মুক্তধারা' নাটকে যন্ত্ররাজের তৈরী বাঁধ ভেঙ্গে ফেলেছেন। বাঁধ বাস্তুতন্ত্রে বিপদ ডেকে আনছে। বাঁধে পলি জমে নদীর তল উঁচু হচ্ছে। বাঁধের জল ধরার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। বর্ষার সময় বাঁধ থেকে জল ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিস্তৃত অঞ্চল বন্যা প্লাবিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলা প্রায় প্রতি বছর বন্যা প্লাবিত হয়। ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যাচ্ছে, চাষের ক্ষেত প্লাবিত হচ্ছে, অবর্ণনীয় দুর্দশায় ভুগছে মানুষ। আজকের উন্নয়নের অর্থনীতি এই যে প্রকৃতি ও সমাজের ধ্বংসের খরচ তা হিসেবের মধ্যে আনে না। তাই এই অর্থনীতিকে দক্ষ বলে মনে হয়। এই যে উদাহরণ একে আমরা বলব ইঞ্জিনীয়ারিং খণ্ডদৃষ্টি।

চাষ ব্যবস্থায় খণ্ডদৃষ্টি

ভারতবর্ষের চাষীরা হাজার হাজার বছরের ফলিত বাস্তুতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা (Practical ecological knowledge) থেকে প্রায় ১২০০০০ রকমের এবং ৪২০০০ ধরনের ধান সৃষ্টি করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫০০০ ধরনের ধান পাওয়া যেত। আজ ৫৫০ ধরনের বেশি ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ধানের জীববৈচিত্র্য লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ বিজ্ঞানের খণ্ডদৃষ্টি। পশ্চিমের বিজ্ঞানীরা বার করলেন উচ্চফলনশীল (High Yielding Variety বা HYV) বীজ। প্রথমে গমে, পরে ধানে। ঐ HYV বীজ প্রয়োগ শুরু হওয়ার পর চাষীরা অধিক লাভ পাবার জন্য HYV ধান চাষ করতে লাগল। চাষীরা ধানের জীববৈচিত্র্য বাঁচিয়ে রাখত প্রতি বছর সাবেকি ধান চাষ করে বীজ ধরে রেখে। HYV চাষ শুরু হওয়ার পর চাষীরা যখন দেশজ বীজ চাষ করা বন্ধ করল তখন ধীরে ধীরে ১৯৬০-এর দশক থেকে দেশজ বীজ লুপ্ত হতে শুরু করল। আমরা জানি প্রাণীজগতে জীববৈচিত্রের কী অবদান। এমন অবস্থা আসছে যে কিছু বছরের মধ্যে চাষীরা ধানের ক্ষেতে মাত্র কয়েক রকমের HYV বীজ ব্যবহার করবে। কোন কারণে এইসব বীজে যদি মড়ক লাগে তাহলে চাষীরা আর দেশজ বীজ পাবে না। বিজ্ঞানের খণ্ডদৃষ্টি ভারতের খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এই HYV বীজ থেকে উচ্চ ফলন পেতে গেলে প্রয়োজন হয় প্রচুর জল, সার ও কীটনাশক। এর ফলে কী সর্বনাশ হচ্ছে ভারতের খাদ্য সুরক্ষার তার আরেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ভারতে যে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বেড়েছে HYV বীজ ব্যবহার করে তা সম্ভব হয়েছে সেখানে মাটির নীচে জলের স্তর ব্যবহার করে। এর কী মারাত্মক ফল হতে পারে তার একটি উদাহরণ দেব ১৯৯২ সালের একটি গবেষণার রিপোর্ট থেকে। গুজরাতে গড় বৃষ্টিপাত মাত্র ৬০ সে: মি:। গুজরাতের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের জমি খুবই উর্বর। কিন্তু যেহেতু বৃষ্টিপাত কম তাই চাষীরা ঐ অঞ্চলের কৃষি-বাস্তুতান্ত্রিক জলবায়ুকে বুঝে পুকুরে, কুয়োতে বৃষ্টির জল ধরে রেখে জোয়ার-বাজরা ইত্যাদি শুষ্ক জমির চাষ করত এবং যুগ যুগ ধরে বাঁচছিল। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে যখন HYV বীজ ভারতে এল তখন ধনী চাষীরা নগদ শস্য উৎপাদনের জন্য নলকূপ বসিয়ে মাটির নীচে থেকে জল তুলতে লাগল। ১৯৫০-এর দশকে যেখানে মাত্র ৯০০ নলকূপ ছিল সেখানে চার লাখ নলকূপ বসানো হল। এর ফলে জলের স্তর নীচে নেমে গিয়ে পুকুর, কুঁয়ো শুকিয়ে গেল। গরীব চাষীরা যারা শুধু জমির ফসল খেয়ে বাঁচছিল তারা পরিবেশ বাস্তুহারা হল এবং গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন শহরে ঝুপড়ি বাসী হল। যত জলের স্তর নেমে যায় ততই গভীর নলকূপ বসল। ফলে

জলের স্তর এত নেমে গেল যে সমুদ্রের জল ঢুকে প্রায় ১২ লক্ষ হেক্টর জমি লবণাক্ত হয়ে বন্ধ্যা হয়ে গেল। বাস্তুতন্ত্রে ও সমাজে এই যে ধ্বংস নেমে এল তার কোন হিসেব নেওয়া হয় না বর্তমান উন্নয়নের অর্থনীতিতে।

বাস্তুতন্ত্র ও চাষব্যবস্থা

সাবেকি পদ্ধতিতে যখন ধান চাষ করা হত তখন যে খড় উৎপাদন হত তা দিয়ে ঘর ছাওয়া হত, গবাদি পশুকে খাওয়ানো হত। উৎপাদনশীল বীজে ধানের খড় দিয়ে যে ঘর ছাওয়া হয় তা ৬ মাস টেকে না। পাল্টাতে হয়। ঐ খড় গবাদিপশু খায় না। সাবেকি চাষে ধানের মাঠে নানারকমের ছোট মাছ, শামুক, গুগলি এবং লতাগুল্ম পাওয়া যায়, যা গরীব মানুষের খাদ্য ছিল। কীট এবং আগাছা নাশক ব্যবহারের ফলে ঐসব জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে গেল।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, শীত কালে যখন বৃষ্টি পড়ে না, তখন ব্যাপক বোরো ধানের চাষ শুরু করে নলকূপ বসিয়ে মাটির নীচ থেকে জল তুলে নিয়ে সেচের বন্দোবস্ত করে। এর মারাত্মক ফল হয় দুটি। মাটির নীচে জলের স্তর নেমে গিয়ে বহু পুকুর, কুঁয়ো নলকূপ শুকিয়ে গেল। এছাড়া মাটির স্তর থেকে আর্সেনিক পানীয় জলে মিশে লক্ষ লক্ষ মানুষ আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত হল। এই তথাকথিত সবুজ বিপ্লব যে সর্বনাশ ডেকে এনেছে আজ ভারতে এই বিপ্লবের জনক ডঃ স্বামীনাথনও স্বীকার করছেন আধুনিক বিজ্ঞানের খণ্ডদৃষ্টিজাত প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রকৃতি ও মানুষ বিপর্যস্ত হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক ভারতের পরিবেশের ধ্বংসের প্রযুক্তির খরচের একটি রিপোর্ট দেয় ১৯৯২ সালে। তাতে দেখা যায় যে ভারতের পরিবেশের ধ্বংসের খরচ হচ্ছে বছরে ৩৪৫০০ কোটি টাকা। তা ১৯৯২ সালের জি ডি পি-র ৪.৫ শতাংশ। এই রিপোর্ট বের হওয়ার পর দিল্লির সেন্টার ফর সায়েন্স এ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট যারা 'ডাউন টু আর্থ' পত্রিকা বার করে তারা ঐ রিপোর্ট অনুসন্ধানের পর দেখে যে আরও কিছু ধ্বংসের খরচ বিশ্ব ব্যাঙ্ক হিসেবে ধরেনি। সেইসব হিসেব করে দেখা যায় যে ভারতের পরিবেশের ধ্বংসের খরচ হচ্ছে বছরে ৫০০০০ থেকে ৭০০০০ কোটি টাকার মত যা জি ডিপি-এর ৭-৯ শতাংশ। অর্থাৎ, আমরা যদি ২-৩ শতাংশ উঠছিলাম অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাহলে ৭-৯ শতাংশ নেমে যাচ্ছিলাম ধ্বংসের খরচে। আমরা আজ বুঝব না এর পরিণাম কী। বুঝবে ভবিষ্যৎ বংশধররা। তাদের বাঁচবার অধিকারকে কেড়ে নিচ্ছে বর্তমান সভ্যতা। তাই আজ আন্তপ্রজন্মের মধ্যে সাম্যের দাবি উঠছে।

আধুনিক ওষুধ ও খণ্ডবিজ্ঞান

বিশ্ব উষ্ণায়ন যেমন বিশ্বের সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রে ধ্বংস আনছে তেমনি এ্যান্টিবায়োটিক অণু বাস্তুতন্ত্রে এক বিরাট বিপদ ডেকে আনছে যা হয়ত মনুষ্য প্রজাতিকে নিশ্চিহ্ন করবে। ১৯৪০-এর দশক থেকে পেনিসিলিনের ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়। এ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে অদৃশ্য ব্যাকটিরিয়া এবং ভাইরাসে পরিবর্তন এসে ঐ অণুজীবে এ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের আগে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণে বহু মানুষ মারা যেত। তাই এ্যান্টিবায়োটিক আজ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি স্তম্ভ। আজ কোন অস্ত্রোপচার এ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া সম্ভব নয়।

কিন্তু পেনিসিলিনের প্রয়োগ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, যে ব্যাকটিরিয়াকে নির্মূল করতে চাইছি তারা নিজেদের পাল্টে ফেলে ঐ এ্যান্টিবায়োটিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে ফেলেছে। এই প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়াকে মারতে রোজ আরও শক্তিশালী এ্যান্টিবায়োটিক তৈরী হচ্ছে। এ যেন ক্ষুদ্র অণুজীবদের সঙ্গে এক অসম যুদ্ধ। সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী অটো কারস বলছেন, "The growing phenomenon of bacterial resistance is now threatening to take us back to pre-antibiotic era."। আমেরিকান পত্রিকা Span লিখছে যে "American hospitals have become factories for new kind of bugs."। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতি বছর ১০ লক্ষেরও বেশি শিশু মারা যাচ্ছে শ্বাস সংক্রান্ত রোগে যারা হয়ত প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় মৃত্যুর আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে পেটের অসুখ। দক্ষিণ এশিয়ায় এ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ সম্বন্ধে তথ্য খুবই সীমিত। হিসেব করা হয়েছে যে প্রতিবছর শ্বাসকষ্টজনিত রোগে যে প্রায় ১০ লক্ষ শিশু মারা যায় তার একটা বড় অংশ মারা যায় ঐরকম প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের জন্য। ১৯৮০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে এক হাজার জনের মৃত্যু হয়েছে পেটের অসুখে। এই পেটের অসুখ Shigella ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফল। এই ব্যাকটেরিয়া সাধারণ এ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে।

শিল্পোন্নত দেশগুলোতেও প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে বহু মানুষ মারা যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে ১৯৯৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে Staphylo-coccus aurcis (SA) ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে মৃত্যু প্রায় দশগুণ বেড়ে গেছে। আমেরিকার একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রতি বছর সেখানে methicillin resistant SA দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ১,২৫০০০ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। তার মধ্যে ৫০০০ রোগী মারা যায়। এইসব রোগীদের চিকিৎসায় আমেরিকাকে প্রতি বছর ৪০০ কোটি ডলার ব্যয় করতে হয়।

প্রকৃতিতে এই যে সব ঘটনা ঘটছে তাতে একদিন এমন সব ব্যাকটিরিয়ায় মানুষ আক্রান্ত হবে যার কোন ওষুধ পাওয়া

যাবে না। এই জন্য অনেক প্রাজ্ঞ মাইক্রোবায়োলজিস্ট বলছেন যে ব্যাকটিরিয়াকে শত্রু হিসেবে ভাবলে চলবে না যাকে এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যুদ্ধে হারাতে হবে। এইসব ব্যাকটিরিয়ার সমুদ্রে মানুষকে সহাবস্থান করবার পথ বার করতে হবে। খণ্ডদৃষ্টি দিয়ে সমস্যাকে দেখলে চলবে না। বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীর হাত থেকে যেদিন বিজ্ঞানী মুক্তি পাবে সেদিনই সত্যিকার বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর খণ্ডদৃষ্টি

বিজ্ঞানের খণ্ডদৃষ্টির আরেকটি প্রমাণ পাই আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এ। বিজ্ঞানীরা এক প্রজাতির জিন অন্য প্রজাতির জিনে প্রতিস্থাপন করে নূতন বীজ সৃষ্টি করছেন। বলা হচ্ছে যে genetically modified (gm) শস্য দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব আনবে। সম্প্রতি নানারকমের gm শস্য সৃষ্টি করা হচ্ছে যার একটি উদাহরণ Bt তুলো। দৈত্যাকার বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান মনসান্টো gm Bt তুলো তৈরি করেছে। ভারতে ছাড়পত্র পেয়ে তা চালুও হয়েছে। ঐ তুলো চাষ করতে গিয়ে বহু তুলো চাষী সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে। Bt তুলো কী? বোলওয়ার্ম নামে কীট তুলোকে আক্রমণ করে। মাটিতে Bacillus thuringiensis (Bt) নামে একরকমের ব্যাকটিরিয়া আছে। ঐ ব্যাকটিরিয়ার একটি জিন এমন একটি রসায়ন উৎপাদন করে যা বোলওয়ার্ম কীটকে প্রতিহত করতে পারে। বিজ্ঞানীরা Bt-এর ঐ জিনকে আলাদা করে তুলোর জিনে প্রতিস্থাপন করেছেন এবং দাবী করছেন যে তাঁরা এমন একটি তুলো উৎপাদন করেছেন যা বোলওয়ার্ম কীটকে প্রতিহত করবে। এই Bt তুলো শুধু বোলওয়ার্মকেই প্রতিহত করতে পারে, অন্য কীটদের নয়।

এখন জিন হচ্ছে কোষের একটি অংশ। এই জিন কোষের অন্য অংশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করছে। কোষ হচ্ছে আবার টিসুর একটি অংশ। সেই টিসু আছে একটি অর্গ্যান-এ, যা আবার শরীরের একটি অংশ। সেই শরীরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে পরিবেশের সঙ্গে। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আসে একটি প্রজাতি ও তার শরীর। একটি প্রজাতির শরীর থেকে একটি জিন আলাদা করে অন্য প্রজাতির একটি জিনের সঙ্গে প্রতিস্থাপন করে দাবী করা যে একটি নূতন প্রাণের সৃষ্টি করা হল, বিজ্ঞানীর এ যেন এক প্রচণ্ড অহমিকা। বিজ্ঞানীরা এখনও সম্যক জানেন না ঐ নূতন বীজ প্রকৃতিতে কী সমস্যার সৃষ্টি করবে।

খণ্ডদৃষ্টির আরেকটি উদাহরণ : বিখ্যাত চিকিৎসা সংক্রান্ত বিজ্ঞান পত্রিকা 'Lancet'-এ কিছুদিন আগে দুই বিজ্ঞানীর এডস সম্বন্ধে এক রিপোর্ট বেরিয়েছে। আফ্রিকার কোন একটি দেশের মানুষ বাঁদরের মাংস খায়। বাঁদররা Simian Immunodeficiency Virus (SIV) দ্বারা আক্রান্ত হয়। মানুষরা যখন বাঁদরের মাংস খায় তখন যদি SIV আক্রান্ত বাঁদরের রক্ত মানুষের রক্তে মিশে যায় তাহলে মানুষের ওপর তার সেরকম কোন প্রভাব পড়ে না। ১৯৫০-এর দশকে আফ্রিকার ঐ অঞ্চলে কোন এক রোগের বিরুদ্ধে WHO ব্যাপক পেনিসিলিনের ব্যবহার করে। উপরোক্ত দুই বিজ্ঞানী দাবী করেছেন যে এ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগের ফলেই SIV পরিবর্তিত হয়ে HIV-তে পরিণত হয়েছে।

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে একটি নূতন ওষুধ বার করার জন্য। নূতন ওষুধ আবিষ্কৃত হলে সেটি একটি বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ঐ ওষুধ অন্য অণুজীবে কী পরিবর্তন আনতে পারে তা বিজ্ঞানীরা আগে থেকে জানতে পারেন না। লাভের জন্য ওষুধ আবিষ্কৃত হবার পর বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে তা পরীক্ষা করে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয়। যখন তার খারাপ লক্ষণ দেখা যায় তখন বাতিল করা হয়। এ্যান্টিবায়োটিকের মত ওষুধ জীবজগতে এক বিরাট সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে বলে অনেক বিজ্ঞানী চিন্তিত।

সমাধান

সমস্যাটা হচ্ছে সমাজের, বিজ্ঞানের নয়। আজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে হাইজ্যাক করেছে পুঁজি ও আগ্রাসী ভোগবাদ। পুঁজিপতিরা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছেন নূতন নূতন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য যা নূতন নূতন পণ্য উৎপাদন করবে লাভের জন্য। তাই বাজারে রোজ নূতন নূতন পণ্য আসছে। মিডিয়ার প্রচারের মধ্যে দিয়ে মানুষের মনে ঐসব দ্রব্যের জন্য কৃত্রিম অভাববোধ তৈরী করা হচ্ছে যা মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়। একটি পণ্য , তা ওষুধ বা নূতন শস্য যাই হোক না কেন, আবিষ্কৃত হবার পরই পরিবেশে তার কি সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া (holistic interaction) তা মূল্যায়ন না করেই বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয় লাভের জন্য। তাই সমাজকে যদি কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে সার্বিক মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করতে হয় তবে সমাজকে পুঁজিবাদ ও ভোগবাদ দুটোকেই পরিত্যাগ করতে হবে। এর জন্য চাই উন্নয়নের এক নূতন সংজ্ঞা যা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে মুক্ত করবে লাভ এবং লোভের কবল থেকে। তখনই আমরা বিজ্ঞানের এই খণ্ডদৃষ্টির সমস্যাকে যুক্তির সঙ্গে সমাধান করতে পারব।